অক্ষরপাত

বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটির
ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র

একাদশ বর্ষ ● তৃতীয় সংখ্যা ● নববর্ষ-১৪২৮

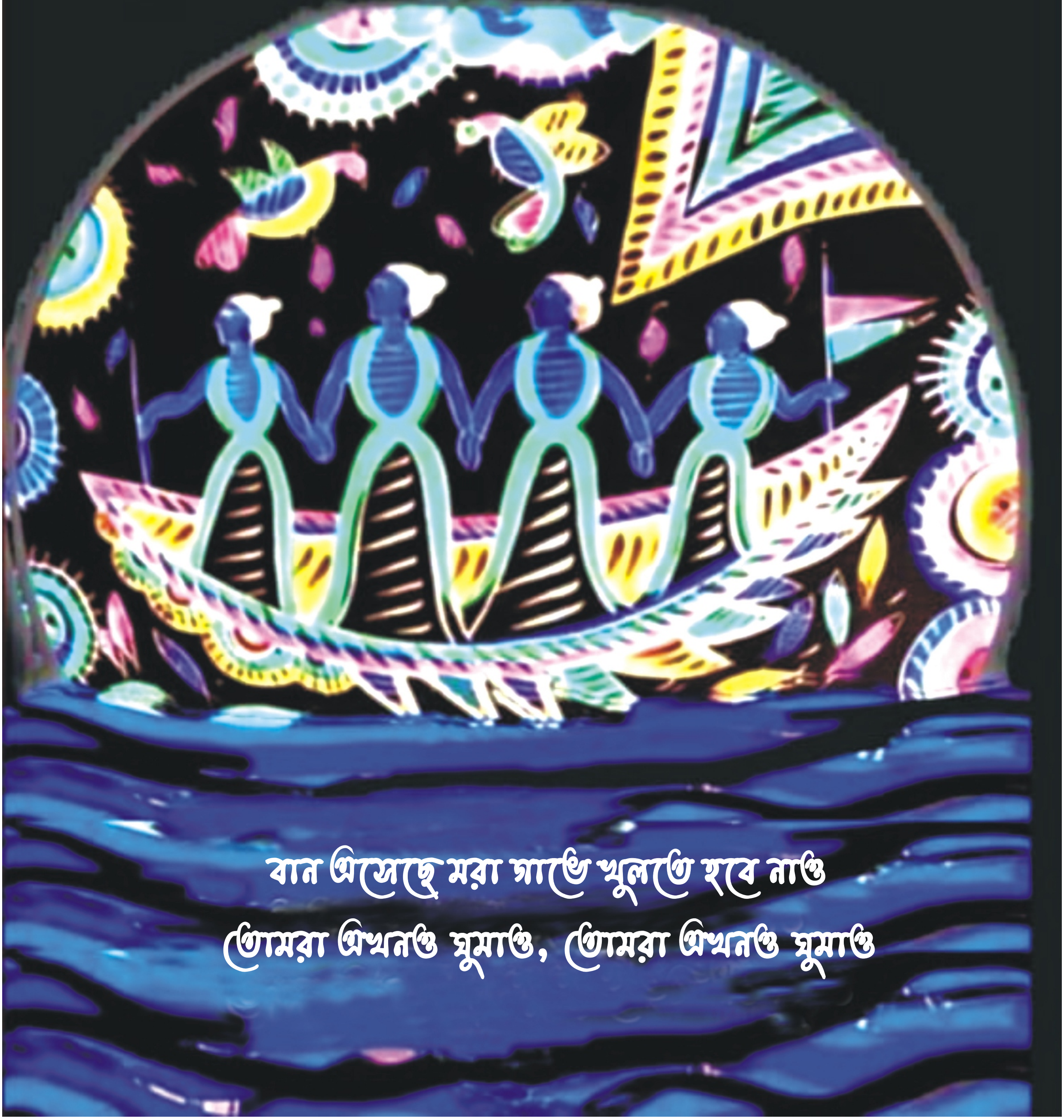

বান এসেছে মরা গাঙে খুলতে হবে নাও
তোমরা এখনও ঘুমাও, তোমরা এখনও ঘুমাও

অক্ষরপাত

বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটির

ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র

একাদশ বর্ষ ● তৃতীয় সংখ্যা
নববর্ষ ● ১৪২৮
এপ্রিল-জুন ২০২১

উপদেষ্টামণ্ডলী :
ডঃ শুভঙ্কর চক্রবর্তী, ডঃ হরপ্রসাদ সমদ্দার,
ডঃ রঞ্জিত সেন, রামরমণ ভট্টাচার্য, রমেশ পুরকায়স্থ,
হরিলাল নাথ, আনসার উল হক,
নবনীতা পাল, কালিদাস আচার্য

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি :
অধ্যাপক পবিত্র সরকার

সম্পাদক : অরিন্দম মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য :
বিকাশ দে, অমিত দে, পাঁচুগোপাল মারিক,
বিশ্বনাথ রাহা, মন্‌জুর আহমেদ, পার্থপ্রতিম পাল,
প্রদীপ মণ্ডল, অশোক দে, রবিরাম হালদার,
রঞ্জন সেন, সোমা চন্দ, অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়

কর্মাধ্যক্ষ : সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক :
অরিন্দম মুখোপাধ্যায়
যোগাযোগ : ৯৪৩৩৩ ৬৬৫১৫
৯০৫১২ ৫৫৮৯১
e-mail : mukherjeearin13@gmail.com

কার্যালয় :
ক্ষিতিভূষণ রায়বর্মণ ভবন,
পদ্মপুকুর মোড়, বারুইপুর, কলকাতা-৭০০ ১৪৪

প্রাপ্তিস্থান :
১) আবুল বাশার বুক সেন্টার (বারুইপুর)
২) পাতিরাম বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট)
৩) চর্চা (গড়িয়া আজাদ হিন্দ পাঠাগারের নিকট)

অক্ষরবিন্যাস ও মুদ্রণ ঃ
দীপক প্রিন্টার্স
৫০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৯
চলভাষ : ৯৮৩০৪৩৯১৩৮
e-mail : dipakkumarhalder2@gmail.com
dipuhalder1964@gmail.com

মূল্য : তিরিশ টাকা

যাঁদের হারিয়ে আমরা বিষণ্ণ

রথীন্দ্রনারায়ণ বসু ঃ বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী

শিশিরকণা ধরচৌধুরী ঃ বিশিষ্ট বেহালাবাদক

ডি এন ঝা ঃ ইতিহাসবিদ

আখতার আলী ঃ টেনিস খেলোয়াড় ও প্রশিক্ষক

রাজীব কাপুর ঃ চলচ্চিত্র অভিনেতা

ইন্দ্রজিৎ দেব ঃ অভিনেতা

দিলীপ সিন্‌হা ঃ প্রাক্তন উপাচার্য, বিশ্বভারতী

নির্ঝরিণী চক্রবর্তী ঃ প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও বিধায়ক

জয়ন্ত বালা ঃ সাক্ষরতা ও গণ আন্দোলনের জনপ্রিয় কর্মী

পবিত্র মুখোপাধ্যায় ঃ বিশিষ্ট কবি

★ ফেয়ারলি প্লেসে রেলের সদর দপ্তরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহত দমকল কর্মী ও মানুষজন।

অক্ষরপাতের নবান্ন-১৪২৮ সংখ্যার সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৪

দেশ-কাল-দুনিয়া

কৃষকের প্রতিবাদের ভাষা / সমীর ভট্টাচার্য ৫

ফিরে দেখা

প্রতিবাদের গান, মৃত্যুহীন প্রাণ / শাশ্বতী দাস (গুহ) ৭

প্রবন্ধের বন্ধন

‘রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি’—প্রসঙ্গ নজরুল / সমীর বন্দ্যোপাধ্যায় ১০
কর্মবীর মহাপ্রাণ রামমোহন / পাঁচুগোপাল মারিক ১৮
সার্ধশতজন্মবর্ষে লেনিন : কয়েকটি কথা / অপূর্বমোহন মুখোপাধ্যায় ২৪

গল্পধারা

বাঁচন-লড়াই / এ কে এম শামসুল হুদা ২৮
দিনলিপি / সায়ন ৩৮
ঝড়ের পাখি / ম্যাক্সিম গোর্কি / অনুবাদ—মিহিররঞ্জন মণ্ডল ৪০
নিখোঁজ বিবেক / পার্থপ্রতিম পাল ৪১
মাছ / অখিল চক্রবর্তী ৪৪

কবিতার ডালি

স্বদেশ / দীপক হালদার ৪৫
ত্রিশঙ্কু / সৈয়দ জিয়াউল হক ৪৫
ডাউন আটটা বাইশ লোকাল / সুব্রত ভুঁইয়া ৪৬
দুটি কবিতা / অনুশ্রী তরফদার ৪৭
উত্তরণ / বাসুদেব ভট্টাচার্য্য ৪৮
শুদ্ধি / অলক্তিকা চক্রবর্তী ৪৮

বিজ্ঞানের পাতা

প্রকৃতির প্রতিশোধ এবং পরিবেশ চেতনার অভিমুখ / তাপস চট্টোপাধ্যায় ৪৯

সংস্কৃতির পাতা

সংস্কৃতি এখন / প্রদীপ ভট্টাচার্য্য ৫২

ভ্রমণ

টুমলিং-এর নীলাদ্রি / ডঃ কৌশিক মুখোপাধ্যায় ৫৪

প্রচ্ছদভাবনা ও অলংকরণ : অরিন্দম মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

রাজ্যের সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচনের তপ্ত আবহে প্রকাশিত হল অক্ষরপাতের নববর্ষ-১৪২৮ সংখ্যা। সকল পাঠক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি রইল পত্রিকার পক্ষ থেকে নববর্ষের শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা।

এই নির্বাচনের আবহে আমরা প্রত্যক্ষ করছি রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও নৈতিকতার মহা অধঃপতন। পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুড়ি, কটুকথা আর নীতিহীন দলবদল। যা আমাদের যতটা ব্যথিত করে তার থেকে বেশি ক্রুদ্ধ করে।

রাজনীতির অঙ্গন থেকে এই সব 'জঞ্জাল' সাফ আমাদেরই করতে হবে। অর্থাৎ জনসাধারণকে। যতদিন না সেই বোধ ও তাগিদ আমাদের সবার মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে ততদিন পুতিগন্ধেই সহবাস ভবিতব্য।

এবারের সংখ্যায় আসন্ন জন্মতিথিকে স্মরণে রেখে কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও রাজা রামমোহন রায়কে নিয়ে দুটি বৃহৎ নিবন্ধ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। রয়েছে লেনিনের জন্ম সার্ধশত বর্ষ উপলক্ষ্যে তাঁকে নিয়ে রচিত একটি নিবন্ধ। 'বিজ্ঞানের পাতা'য় রয়েছে আগামী বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে উপলক্ষ্য করে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার তাপস চট্টোপাধ্যায়ের লেখা একটি অসাধারণ নিবন্ধ। এছাড়া আরো কয়েকটি নিবন্ধ, গল্প, কবিতায় সাজানো হয়েছে এ সংখ্যা। তবে এবারের সংখ্যায় শিক্ষা প্রসঙ্গে, খেলার পাতা, গ্রন্থ আলোচনা ও সংগঠন সংবাদ অনুপস্থিত থাকল। এর জন্য আমরা দুঃখিত।

সবাই ভালো থাকুন। চেতনে থাকুন।

দেশ-কাল-দুনিয়া

কৃষকের প্রতিবাদের ভাষা

সমীর ভট্টাচার্য

চিত্র পরিচালক মৃণাল সেনের তৈরি করা কলকাতা ট্রিলজির একটি ছবি 'কোরাস'-এর শেষ দৃশ্যের কথা সেদিন চোখের সামনে ভেসে উঠল যেদিন দিল্লি সীমান্তে এ দেশের বিদ্রোহী কৃষকদের স্রোত প্রতিরোধ করতে রক্ষীবাহিনী দিল্লি সীমান্তে অবরোধের প্রাচীর তৈরি করল লোহার শলাকা আর অন্যান্য উপকরণ দিয়ে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসকের ভীরুতার আর এক প্রতিচ্ছবি যেমনটা মৃণাল সেন তার ছবিতে দেখিয়েছিলেন। পুঁজি মালিকদের প্রতিনিধি উৎপল দত্ত তার দুর্গের মধ্যেও নিরাপদ বোধ করছেনা রক্ষীবাহিনীর তৈরি করা কাঁটাতারের অবরোধের মধ্যে এবং তাদের প্রহরায় থেকেও। আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে শুধু নিরাপত্তার করুন আকুতি রক্ষীদের কর্তার কাছে বেতার মাধ্যমে। কারণ, তিরিশ হাজারের বেকার চাকরিপ্রার্থীর বাহিনী তার দুর্গের দিকে ধেয়ে আসছে। রক্ষীবাহিনীর কর্তা বেতার বার্তায় জানাচ্ছে ওরা তিরিশ হাজার সংখ্যা অতিক্রম করে লাখে লাখে এগিয়ে আসছে। ওরা প্রতারিত, বঞ্চিত মানুষের দল—শ্রমিক, কৃষক, বেকার ইত্যাদি। পরবর্তী নির্দেশ জানতে রক্ষীবাহিনীর কর্তা বেতারে বারে বারে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ উৎপল দত্তর কোনো সাড়া নেই। দুর্গের ছাদের ওপর রাডার ঘুরেই চলেছে।

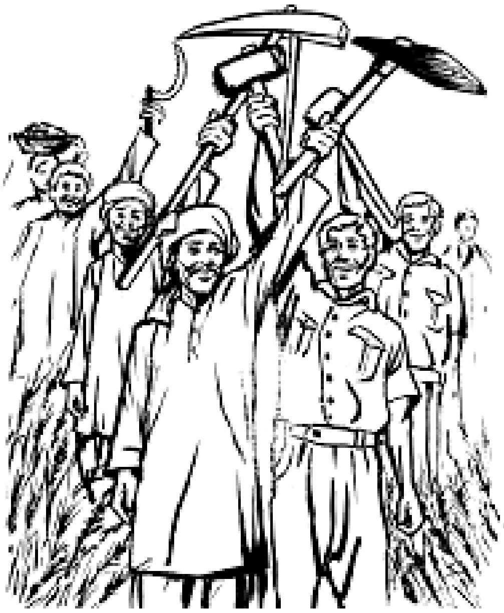

সেরকম আতঙ্কই আজ ঘিরে ধরেছে দিল্লির কেন্দ্রীয় শাসকদেরও লক্ষাধিক কৃষকদের জমায়েতের প্রতিবাদের ভাষা পড়ে। এ ভাষা শুধু সমবেত কৃষকদের প্রতিবাদের ভাষা নয়, এর পেছনে আছে কোটি, কোটি কৃষক তথা প্রতারিত, বঞ্চিত সাধারণ মানুষের পুঞ্জিভুত ক্ষোভের প্রতিফলন। দলে দলে সেইসব মানুষের প্রতিনিধিরা আসছেন, বিক্ষোভের প্রতি সহমর্মিতা জানাচ্ছেন। দেশব্যাপী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে। জবরদস্তি করে ভয় দেখিয়েও কাজ হয়নি বরং খবর ছড়িয়ে পড়তেই দলে দলে গ্রাম গ্রামান্তর থেকে কৃষকরা এসে চলমান বিক্ষোভকে পুষ্টি জুগিয়েছেন। আন্তর্জাতিক মহল বিস্মিত শুধু নয় একের পর এক সহমর্মিতার বার্তা পাঠিয়েছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং এমনকি কোনো কোনো দেশের শাসকরাও। কৃষক বিক্ষোভ স্বভাবতই এ দেশের শাসকদের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। চেষ্টা হয়েছে তাই অপবাদ দিয়ে অন্য অংশের মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন করার। খালিস্থানী, পাকিস্তানী, দেশদ্রোহী, আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ইত্যাদি সমস্ত অপবাদ দেওয়া হলেও মানুষ বিশ্বাস করেনি। নাশকতার প্রমাণ প্রচার করার জন্য হাতিয়ার করা হল ২৬শে জানুয়ারির লাল কেল্লায় পতাকা ওড়ানোর ঘটনাকে কিন্তু পরিণতি হল বিপরীত। ওই ঘটনা দিল্লির কেন্দ্রীয় শাসক দলের যে ব্যক্তিকে ব্যবহার করে করা হয়েছিল কৃষকদের দেশদ্রোহী প্রমাণ করতে তা প্রকাশিত হয়ে পড়ল। বারে বারে শাসকদের পক্ষ থেকে কৃষক আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করার জন্য যে নানারকম ঘটনা ঘটানো হয়েছিল তা জনসমক্ষে উন্মোচন করে দিয়েছেন বিভিন্ন মুক্তমনা সাংবাদিক এবং সংবাদমাধ্যম যারা পুঁজি নিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যমের দাসত্ব করেননা। পরিণতিতে তাদেরও শাসকের রোষানলে পড়ে কারাবাস পর্যন্ত করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত দেশের উচ্চতম ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ হয়েও ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌছানো গেলনা।

ন্যায়ালয়ের তৈরি করে দেওয়া কমিটি থেকে তথাকথিত কৃষক প্রতিনিধির পদত্যাগে এবং কৃষকদের নিজেদের দাবির প্রতি অচল অবস্থানের কারণে। সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হওয়ায় শাসকের বিচ্ছিন্নতা তাকে গ্রাস করেছে বিপরীতে সমস্ত শারীরিক ও মানসিক আক্রমণকে প্রতিহত করে কৃষকরা সমাজের বিভিন্ন অংশের সমর্থন পেয়ে আরও ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তি সংহত করেছেন। শাসকের আতঙ্ক তাকে গ্রাস করছে দূর্গ রক্ষার ব্যর্থ প্রচেষ্টায়।

দুর্গ শেষ পর্যন্ত রক্ষা হবে কি না তা ভবিষ্যৎ বলবে কিন্তু কৃষক বিদ্রোহ যে রাষ্ট্রশক্তিকে পর্যুদস্ত করতে শুরু করেছে এ সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট। বর্তমান রাষ্ট্রশক্তির পরিচিত ভাষ্যকে ভেঙে চুরমার করেছে কৃষকেরা ধর্ম, বর্ণ, জাতি, উপজাতি নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে। কোনো বিভাজনের রাজনীতি এখানে কাজ করেনি। এই কৃষক বিদ্রোহ এক চিরাচরিত সত্যকে পাদপ্রদীপের আলোতে নিয়ে এসেছে যে বর্তমান রাষ্ট্র আসলে ধান্দার ধনতন্ত্রের ক্রীড়নক। একেবারে আদামী আম্বানীদের নাম করেই সেই বাজীগরদের চিনিয়ে দিয়েছে যাদের স্বার্থ রক্ষা করাটাই বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধানের একমাত্র স্বার্থ। প্রকৃত অর্থেই বর্তমান রাষ্ট্র নায়কদের চরিত্র উন্মোচিত। বর্তমান রাষ্ট্রশক্তির প্রতিনিধিদের তাদের শক্ত জায়গার রাজ্যগুলোতেই কোণঠাসা করেছে কৃষকরা বিশাল বিশাল মহাপঞ্চায়েত নামক সমাবেশ ঘটিয়ে। ক্রমাগত এই ঘটনাবলী বর্তমান রাষ্ট্রশক্তিকে এমনভাবেই কোণঠাসা করেছে যে আজ তাদের দুর্গ রক্ষা করাটা প্রশ্নের সম্মুখীন।

আসলে কৃষকদের শক্তির উৎস হল নিজেদের অদম্য মনোবল এবং অধিকাংশ দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন। কৃষকরা দাবি করেছেন যে তিনটি কৃষি বিল বাতিল করতে হবে। আর এই তিনটি কৃষি বিল শুধুমাত্র কৃষকদের স্বার্থ সম্বলিত নয়, জন স্বার্থও ভীষণভাবে জড়িত। কৃষি পণ্যের বাজারকে সম্পূর্ণভাবে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার অর্থ খাদ্যপণ্যের বেলাগাম মুল্যবৃদ্ধি যার সাথে সমস্ত মানুষের স্বার্থ জড়িত। অত্যাবশ্যক পণ্য আইনকে বাতিল করার অর্থ মজুতদারী ব্যবস্থাকে যা কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে, তাকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া। সমগ্র জনতাই এর ফলে বিপদগ্রস্ত হবে। চুক্তি চাষের আইন পুনরায় নীলচাষের ভয়াবহ দিনগুলিকে ফিরিয়ে আনবে। স্বভাবতই এই তিনটি আইন শুধু কৃষক স্বার্থ বিরোধীই নয়, জনস্বার্থ বিরোধীও। তাই কৃষক সমাজ একা নয়, কোটি কোটি জনতা তাদের সমর্থনে এগিয়ে আসছে। রাষ্ট্রশক্তির তৈরি করা অবরোধের প্রাচীর তাদের আতঙ্ককে নিরসন করতে অক্ষম কারণ, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনেরও এক অন্তর্নিহিত শক্তি থাকে।

ফিরে দেখা

প্রতিবাদের গান, মৃত্যুহীন প্রাণ

শাশ্বতী দাস (গুহ)

পল রবসন

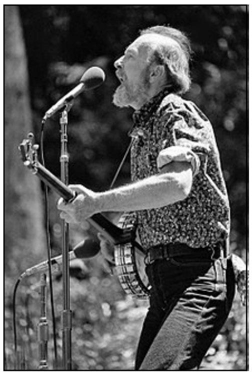

পিট সিগার

বব ডিলান

ষাটের দশকের শুরু। পৃথিবীর বহু দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের একটা অঙ্গ হিসেবে পরিবর্তন এসেছিল গানের জগতেও। গায়ক-গীতিকারেরা গানের বিনোদন ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করলেন। হয়ে উঠলেন সমাজবন্ধু। আমেরিকার বুকে ক্রমশঃ জনপ্রিয় হচ্ছিল লোকগান। অনেক যুদ্ধ-বিরোধী গানও লেখা হচ্ছিল। একজনের গান—অন্যজন গেয়ে বিখ্যাতও হচ্ছিলেন। মুক্তিকামী মানুষের বুকে তখন গান জ্বালিয়ে দিয়েছিল—‘প্রতিরোধের আগুন’।

পল রোবসন (১৮৯৮-১৯৭৬)-এর গানের উপর বারবার এসেছে রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা ও দমনপীড়ন।

এসেছেন পিট সিগার (১৯১৯-২০১৪)। ১৯৪৯ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার পিকস্কিলে ৮০টি শ্রমিক সংগঠন পল রোবসনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। কিন্তু উগ্র ফ্যাসিস্টরা অনুষ্ঠানস্থল তছনছ করে। বহু মানুষ আহত হয়। কিন্তু সাতদিন বাদে উদ্যোক্তারা আবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেখানে দলবল নিয়ে গাইতে আসেন স্বয়ং পিট সিগার। পঁচিশ হাজার লোকের সামনে পরিবেশিত হয় এই গান ঃ—

‘আমরা নড়বো না/ঠিক যেন নদীর পাড়ে দাঁড়ায়ে একটি গাছ না, আমরা নড়বো না (We shall not be moved), এতে গলা মেলান স্বয়ং রোবসন।

এইভাবে ষাটের দশকের প্রথমার্ধ চিহ্নিত হয়ে আছে—নাগরিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনের জন্য। একদিকে জনসমুদ্রে জোয়ার তুলছেন মার্টিন লুথার কিং, অন্যদিকে পিট সিগার করছেন তাঁর প্রশ্ন তাঁর গানে গানে—“where have all the flowers gone?” সমগ্র মার্কিন দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ পিটের গানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে শপথ নিল ঃ “We shall overcome”

এর কিছুদিন বাদেই পিট গলায় তুলে নিলেন—মালভিনা রেনল্ডস রচিত গান, যে গানে তিনি নিপীড়িত মানুষের বিজয়কে তুলে ধরলেন—

‘প্রভু রক্ষা করুন ঘাসেদের যারা ফাটলে উঁকি মারে
কংক্রিটে চাপ দিয়ে তারা ক্রমেই ধীরে বাড়ে।
কংক্রিট হল ক্লান্ত/আর কি আছে করার
ভেঙে পড়ে/শেষে ঘষে বেড়ে ওঠে আকাশে মুখ তার।’

God bless the grass that grows through the crack.
They roll the concrete over it to try and keep it back
The concrete gets tired. Of what it has to do.
It breaks and it deuckles and the grass grows through.

আসলে সময়টাকে বুঝতে হবে। মনে রাখতে হবে সেই সময়কার বিশ্ব পরিস্থিতির অ-স্থিতাবস্থা, সাম্রাজ্যবাদ, আগ্রাসন, রাষ্ট্রীয় প্রতাপের নির্লজ্জতা। তার পাশাপাশি প্রতিবাদী মিছিল, শান্তির জন্য আকুলতা।

এই সংক্ষুব্ধ মঞ্চে পা রাখলেন জন লেনন, বব ডিলান।

জন লেননের জন্ম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার মাঝে যখন জার্মান বাহিনী বিমান আক্রমণ চালাচ্ছে। অথচ কি অদ্ভুত

পরিহাস! এই শিশুই বড়ো হয়ে গানের মাধ্যমে সারা পৃথিবীকে উদ্দীপ্ত করবেন যুদ্ধেরই বিরুদ্ধে।

ঊনিশ শতকের সাত-এর দশক। ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে মার্কিন শক্তি —যা ছিল মানবতার বিরুদ্ধে এক বড়ো অন্যায়— সেই আবহে গিটারের ঝংকারে লেনন গেয়ে ওঠেন... 'Power to the people'—এর মতো গান। সঙ্গীতের সব আগল ভেঙে মানুষকে আহ্বান করেন মন খুলে পৃথিবীটাকে অন্য চোখে দেখতে। লেননের Imagine গান—আজ পর্যন্ত পরিচিত বিশ্বশান্তির অন্যতম প্রধান হিসাবে—

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die or
And no religion too.
Imagine all the people living in peace.
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed and hunger
A brotherhood of man.
Imagine all the people sharing all the world.

Beatles মানে লেনন, লেনন মানে একটি যুগ। Beatles -এর মত এক সফল ব্যান্ডদলের প্রতিষ্ঠাতা—সদস্য খ্যাতি ও সুনাম ছেড়ে, নেমে পড়লেন মানবতার কাজে। অর্জন করা প্রচুর অর্থ ও খ্যাতি উপভোগ করে বেঁচে থাকতে চাননি তিনি।

১৯৬৫ সালে ব্রিটেনের মহারানির তরফ থেকে লেনন-সহ সমস্ত 'বীটলস্' সদস্যদের যে মেডেল দেওয়া হয়.... ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকাকে সমর্থনের জন্য লেনন সেই মেডেল ফিরিয়ে দেন মহারানীকে ..... চারবছর পর।

ভেদাভেদহীন মানব সমাজের স্বপ্নকে গানের উপজীব্য করে তুলেছিলেন জন লেনন। যেখানেই যুদ্ধ, দাঙ্গা, বর্ণবিদ্বেষ, সেখানেই লেনন। তিনিই তখন প্রতিবাদী তরুণদের মুখপাত্র। ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদের পাশাপাশি সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনেও সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল তাঁর দৃপ্ত কণ্ঠস্বর।

ধর্ম কি, যুদ্ধ কেন, লোভ-লালসা, একে অপরকে অশ্রদ্ধা করা—এসব নিয়ে শুধু প্রশ্ন করেই থেমে যান নি, সংগীতকে বাহন করে প্রশ্নগুলি তুলে ধরেছেন সবার সামনে, ছড়িয়ে দিয়েছেন সবার মধ্যে।

১৯৬৯ সালে 'Give Peace a Chance' গানটি ছিল সরাসরি মার্কিন প্রশাসনকে উদ্দেশ্য করে লেখা....

Let me tell you now
Ev'ry body's talking about
Revolution, evolution, musterbation
Flagellation regulation, integrarions
Meditations, United Nations, congratulations
All we are saying is give peace a chance.

কথাগুলি এখনও কত প্রাসঙ্গিক, তাই না?

এসব বিরোধী কথা ও গান প্রচারের ফলে তখনকার আমেরিকার নিক্সন সরকার লেননকে যুক্তরাষ্ট্রথেকে তাড়িয়ে দিতে চান কিন্তু সফল হননি।

'আমরা (দ্য বিটলস্) এখন যীশুখ্রীষ্টের চেয়েও জনপ্রিয়' ধর্মসম্পর্কে এই ধরনের মন্তব্যের কারণে হোক অথবা রাষ্ট্রশক্তির কণ্ঠরোধের কৌশলেই হোক ১৯৮০ সালে লেননকে সাতবার গুলি করা হলে মাত্র ৪০ বৎসর বয়সেই জন লেননের মৃত্যু হয়। কিন্তু শরীরের মৃত্যু হলেও তাঁর সঙ্গীতের মৃত্যু হয়নি।

১৯৪২-এ বব ডিলানের জন্মলগ্নে-ই পার্ল হারবারে বোমাবর্ষণ। আমেরিকার বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল ভিয়েতনাম ববকে করে তুলল প্রতিবাদী। অযৌক্তিক লোকক্ষয় এবং অস্ত্রের ঝনঝনানির প্রতি তাঁর তীব্র কটাক্ষ আমরা শুনব এই গানে—

Come you masters of war
You that build the big guns.
You that build the death planes.
You that build all the bombs
You that hide behind desks
I just want you to know
I can see through your masks
You that never done nothing.
But build to destroy.
You play with my world
Like it's your little toy.

এটা বিদ্রূপ না বেদনা?

এরকম আর একটি মর্মভেদী অথচ মজার গান :

When the second world war came to an end
We forgave the Germans. And we are friends
Though they murdered six millions.

সালটা ১৯৫৫। এমেট টিল—১৫ বছরের একটি অপরিণত বুদ্ধির কিশোর—শিস দিয়ে ফেলে প্রবল আবেগে—এক কিশোরী শ্বেতাঙ্গিনীকে দেখে। কৃষ্ণাঙ্গ ছেলের এত স্পর্ধা! নির্মমভাবে তাঁর প্রাণ নেয় কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ কাপুরুষ! এই হত্যাকাণ্ডের অমানবিক দিক নিয়ে বব ডিলান লিখলেন তাঁর অবিস্মরণীয় সেই গান—

"The Death of Emmett Till"

"Then they rolled his body down a gulf
amidst a bloody red-rain.
And they throw him in the waters
to cease his sereaming pain."

এই গানটির উত্তরাধিকার বহন করে ১৯৬৩ তে ফিল ওকস লিখে ফেললেন—"There but for fortune"...এক বুক কান্না জমা হয় এই গান শুনলে। পরের বছর জোয়ান বায়েজের গলায় শোনা গেল ফিলের এই 'অন্যরকম' গানটি। সঙ্গে সঙ্গে এর জনপ্রিয়তা আকাশকে চুম্বন করল। বাকিটা ইতিহাস। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল ফিলের এই অমর কীর্তি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০২০-র অতিমারিকে তোয়াক্কা না করেই পথে পথে মানুষের ঢল নেমেছে বর্ণবিদ্বেষের বিরোধিতায়। জর্জ ফ্লয়েডের মর্মান্তিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে স্লোগান উঠেছে "Black lifes matters" এই সময় ফিলের এই গান মানুষকে মনে করিয়ে দিচ্ছে শুধুমাত্র চামড়ার রঙের জন্য কত কৃষ্ণাঙ্গের জীবন কেটে গিয়েছে... কারাগারের কালো অন্ধকারে।

"Show me a prison, Show me a jail.
Show me a Prisones whose face has gone pale."

কৃষ্ণাঙ্গ হত্যার প্রতিবাদে আট বছর বাদে (টেম্পেস্টে ছিল শেষ অ্যালবাম/২০১২) জ্বলে উঠলেন, কামব্যাক করলেন বব ডিলান।

Allew Ginsberg 1965 সালে এক শব্দবন্ধ 'flower-Power' -এর মাধ্যমে সমাজ বদলের লক্ষ্যে এক ইতিবাচক বার্তা দিলেন, 'শান্তি'-কেই তিনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চাইলেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধী সকল মানুষকে এই ভাবধারায় তিনি অনুপ্রাণিত করলেন। যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন ক্রমশঃ নাগরিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনে পরিবর্তিত হল। 'স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ'-এ প্রাধান্য পেল মানুষকে ভালোবাসার কথা, শান্তির কথা। (Flower became the ultimate symbol of peace and love) একটি প্রবন্ধে তিনি লিখলেনও—"Marches should bring harmonicas, flutes, recorders, guitars, banjos and violins."

Giusberg- এর এই জীবনদর্শনের একটি প্রেক্ষিতও ছিল। ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে আমেরিকার এই আক্রমণকে সমর্থন করেছিল Hells Angels Motor Cycle Gang. এরা ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভারসিটিতে যুদ্ধবিরোধী কর্মকাণ্ড হলে সেখানে গিয়ে এমন অত্যাচার চালাত যে অনুষ্ঠান ব্যহত হবার ভয় থাকত সর্বক্ষণ।

Flower Power Movement-এর প্রভাব পড়েচিল 'রক' মিউজিকের ওপরও। ১৯৬৭-র গ্রীষ্মে Beatles এর হিট গান "All you need is love" প্রতিষ্ঠা পেল প্রতিবাদী আন্দোলনের শপথ সঙ্গীত হিসাবে ঃ There's nothing you can do that can't be done—
Nothing you can sing that can't be sung.
... ...
... ...
All you need is love
Love is all you need

এইভাবে মানুষকে ভালোবাসার কথা ছড়িয়ে পড়ল মানুষের গানের মাধ্যমে।

বিশিষ্টপ্রাবন্ধিক ও রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ সুধীর চক্রবর্তী বলছেন ঃ "কৃষি নির্ভর গ্রামিক উদ্ভাসন আর ডিলানদের folk এক নয়। ... রুমরা folk অর্থে লোক না বলে বলতে চাইলেন Narod, যার মানে জনগণ। জামার্নিতে ব্রেখট প্রস্তাব দেন জার্মান Volk (লোক) না বলে বলা হোক Bevolkerurg অর্থাৎ Population... অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত, গ্রামনিবাসী সরল হৃদয় লোকগীতিকার এরা হতে চাননি। এঁদের বয়ান সর্ব অর্থে জনতাকে ঘিরে।"

আগেই বলেছি সেই কাল-সন্ধিক্ষণে একের গান অন্যজন গেয়ে বিখ্যাত হচ্ছেন। কপিরাইটের কোনো তর্ক নেই। তাই তো ফিল ওকসের গান জোয়ান বায়েজের গলায়। লেননের প্রতিবাদী গান 'Give peace a Chance' গেয়ে, পাঁচ লাখ প্রতিবাদীকে নেতৃত্ব দিয়ে—ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে পিট সিগার মিছিল করেন (১৯৬৯)। আবার ১৯৬৩ তে জোয়ান বায়েজ তিনলাখ ক্ষুব্ধ জনসংঘ নিয়ে নাগরিক মিছিলে হাঁটেন 'We shall overcome"—গেয়ে।

লাখ লাখ মানুষের কণ্ঠে থাকবে গান—যা শান্তি ও মানবতার সপক্ষে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে উচ্চকিত হবে। Art is not a pleasure trip, it is a battle. তাই ভিয়েতনামের মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন আমেরিকার শিল্পীরাই, চীন দেশের তিয়েনআনমেন স্কোয়ারে ছাত্রদের উপর নির্বিচার গুলি বর্ষনের নিন্দা ধ্বনিত হল জোয়ান বায়েজের গলায়—

But it seems that the spring
this year in Beijing
Come just before the Fall
There was no summer at all
In Tlan-an-men square.

এইভাবে বর্ণবৈষম্য, জাতিবৈষম্যের বিরুদ্ধে, দেশকালের গণ্ডী ছাড়িয়ে বারবার গান হয়ে উঠেছে বিরুদ্ধতার চাবুক। আর সেই চাবুককে সামলাতে গিয়ে নাজেহাল হতে হয়েছে সকল দেশের কায়েমী স্বার্থরক্ষাকারী সমস্ত অগণতান্ত্রিক, স্বেচ্ছাচারী সরকারকে।

তথ্য সহায়তা :
কঙ্কন ভট্টাচার্য্য (পিট সিগার), গুগল, দ্বৈপায়ন মজুমদার।

প্রবন্ধের বন্ধন

[কাজী নজরুল ইসলামের আগামী জন্মদিবসকে স্মরণে রেখে সন্নিবেশিত করা হল এই নিবন্ধ—সম্পাদকমণ্ডলী]

'রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি'—প্রসঙ্গ নজরুল

সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়

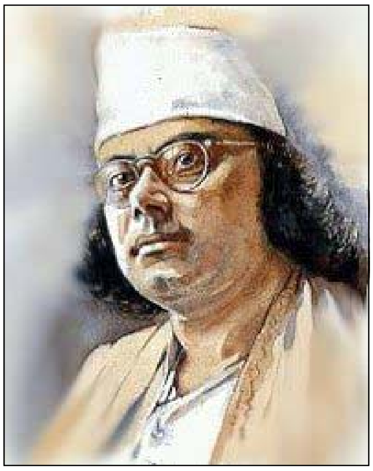

বাংলা সাহিত্যের আকাশে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কাজী নজরুল ইসলাম। এই জ্যোতিষ্ক থেকে বিচ্ছুরিত আলোর রক্তিম আভায় বাংলার জনমানসে জমে থাকা জড়ত্ব, ভয়ভীতি, নিষ্প্রাণতা দিগন্তে বিলীন হয়ে গেল। জন্ম নিল 'উন্নত শির', 'শাসন-ত্রাসন' সংহারক, 'দুরন্ত-দুর্মদ', 'মানব-বিজয়-কেতন, ওড়াবার 'চিরদুর্জনয়' সৈনিক। বিলীন হয়ে গেল চৈতন্যে জমে থাকা গ্লানি। দৃপ্ত কণ্ঠে তারা ঘোষণা করল তাদের সংকল্প—

"মহা   বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি   সেইদিন হব শান্ত
যবে   উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি   সেই দিন হব শান্ত।"

সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় নজরুলের বিবরণ ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ। নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) সাহিত্য চর্চা করেছেন তেইশ বছর (১৯১৯-১৯৪২)। এর মধ্যে প্রথম দশ বছর গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং প্রধানত কবিতা রচনা করেছেন, শেষ তেরো বছর সৃষ্টি করেছেন মূলত সঙ্গীত এবং তাতে সুরারোপ করেছেন। কবিতার মাধ্যমে তিনি যেমন জনমানসে গণজাগরণের প্রবল স্রোত প্রবাহিত করে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছেন—সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অনন্য। বিষয় বৈচিত্রে, সুরে রাগরাগিনীর সুদক্ষ ব্যবহারে এবং বিভিন্ন রাগের সংমিশ্রণে নতুন রাগ সৃষ্টিতে তিনি বাংলা সঙ্গীত জগতে অনন্য অবদান রেখে গেছেন। তিনি প্রায় সাড়ে তিন হাজার সঙ্গীত রচনা করেছেন। সংখ্যার দিক থেকেও তিনি ছিলেন অতুলনীয়। সঙ্গীত রচনা এবং সুরারোপে তিনি যে অনায়াস দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তার ভিত্তিভূমি তৈরি হয়েছিল 'লেটোর গান'এ। দারিদ্রপীড়িত নজরুল বাল্যকালেই পেটের দায়ে লেটোর দলে যোগ দেন, লেটোর গান রচনা করেন ও সুর দেন।

বিংশ শতাব্দির প্রথম দুদশকে চারজন কবি যথাক্রমে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক এবং কালিদাস রায় ছিলেন রবীন্দ্রপথের অনুগামী। সমকালে আর পাঁচজন কবি যথাক্রমে প্রমথ চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার এবং নজরুল ইসলাম চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্র আলোকচ্ছটাকে অতিক্রম করে নতুন সৃষ্টির উপকূলে তরী ভেড়াতে। কিন্তু নজরুল ইসলাম ছাড়া অন্য চারজন কবির সৃষ্টিতে সমকালের আর্তি অর্থাৎ পরাধীনতা, মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচার, শোষণ নিপীড়ন এবং তার থেকে মুক্তির পথনির্দেশ তেমনভাবে পাওয়া যায় না।

এখানেই নজরুল ইসলামের বিশিষ্টতা। তিনি আবির্ভূত হলেন অগ্নিবীণা হাতে বিদ্রোহীর বেশে। কল্পনা-বিলাসিতার আবেগ নয়, "নজরুলের মানসিকতায় মুক্তিকামী চেতনার তীক্ষ্ণতা গভীর প্রেরণার সৃষ্টি করেছিল, এবং এ কারণেই যুগসমস্যার উচ্চকণ্ঠ কবিরূপে তিনি স্বদেশের প্রাণসত্তায় ব্যাপক আলোড়ন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।... নজরুল কাব্যে যুগাভিসারী জীবনবোধের যে তীব্রতা আছে তার প্রাণধর্মের সজীবতায় তিনি যে নতুন রীতির প্রবর্তন করলেন বাংলা কাব্যে তার উৎস সন্ধান প্রায় অসম্ভব।"

অকৃত্রিম মানবদরদী নজরুল শুধু মানুষের দুঃখ, কষ্ট,যন্ত্রণা তাঁর কাব্যে চিত্রিত করে ক্ষান্ত থাকেননি। দুঃখ কষ্টের কারণগুলো উল্লেখ করে শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামেরও আহ্বান জানিয়েছেন।

দেশপ্রেমিক নজরুল দেশের স্বাধীনতা হরণকারী সাম্রাজ্যবাদকে যেমন তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন একই সঙ্গে দেশবাসীর 'চিতে চেতন' সঞ্চারিত করে তার থেকে মুক্ত

হওয়ার জন্যে “লৌহকপাট” ভাঙ্গার বজ্রনাদী আহ্বান জানিয়েছেন।

দেশে মুক্তিসংগ্রাম চলাকালীন সময়ে নজরুলই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে পূর্ণ-স্বাধীনতা হিসেবে মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। তিনি মনে করতেন স্বাধীনতা তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। “জাতীয় স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একান্ত করে নির্যাতিত শ্রেণির মুক্তির কথা ভেবেছেন। তাঁর পূর্বসুরীরা বলেছেন জাগো দেশ, জাগো জাতি। নজরুল বললেন জাগো নিপীড়িত, জাগো কৃষক—জাগো শ্রমিক, জাগো নারী। এখানে তাঁর স্বাতন্ত্র স্পষ্ট এবং এখানেই তিনি যুগোত্তর।”

“নজরুল একই সঙ্গে ‘কালজ’ এবং ‘কালোত্তর’।” সমকালের সঙ্গে নিষিক্ত না হয়ে, সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতিকে দৃষ্টির আড়ালে রেখে, সমাজস্থ মানুষের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনায় শরিক না হয়ে কোনো মহৎ সৃষ্টি সম্ভব নয়। সমকালের বিভিন্ন ঘটনার সন্নিপাতে নজরুল হয়ে উঠেছিলেন অসমসাহসী বিপ্লবী কবি। সাম্রাজ্যবাদী এবং সামন্তবাদী শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট মানুষের অসহনীয় যন্ত্রণা, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অংশ হিসেবে যুগপত অসহযোগ আন্দোলন এবং সশস্ত্র বিপ্লবীদের আন্দোলনের তীব্র গতিবেগ এবং তা দমন করার জন্যে অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারের অমানবিক, আসুরিক চন্ডনীতি, সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ বিষের তীব্র হলাহল যেমন তাঁকে বিক্ষুদ্ধ করে তুলেছিল, অন্যদিকে নভেম্বর বিপ্লবের আলোকে পৃথিবীর দেশে দেশে গণচেতনার উন্মেষ, সমাজব্যবস্থায় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র বেং সাম্যের দাবির অপ্রতিরোধ্য প্রসার তাঁর মানসিক গঠনকে বিপ্লবমুখী গড়ে তুলতে প্রভূত সাহায্য করেছিল। অপরদিকে শ্রমিক কৃষকদের অতি আপনজন মুজফ্ফর আহমেদের নিবিড় স্নেহশীল সাহচার্য নজরুলকে রুদ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করতে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। নজরুলের সত্তায় বিপ্লবের বীজ বপন করতে আর একজন মানুষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি হলেন সিয়ারশোল উচ্চ বিদ্যালয়ের (যেখানে নজরুল ১৯১৪-১৯১৭ ছাত্র ছিলেন।) শিক্ষক এবং যুগান্তর দলের একনিষ্ঠ কর্মী শ্রী নিবারণ ঘটক। এইসব মিলিয়ে যে নজরুল গড়ে উঠেছিল বুদ্ধদেব বসু'র মতে, “সবকটা জানালা খুলে নতুনের হাওয়া প্রথম যিনি সবেগে বইয়ে দিলেন তিনি নজরুল ইসলাম।”শ্রদ্ধেয় কল্পতরু সেনগুপ্তের মতে,“তাঁর কাব্যে একটা কাল, এবং সেই কালের স্বপ্ন ও সাধনা প্রতিফলিত হয়েছে, কালান্তরের বাণী প্রকাশিত হয়েছে।....দেশের যুব সমাজের মনে কালচেতনা উদ্দীপিত করেছেন। তাঁর মতো এত নির্ভিকভাবে, এত সচেতনভাবে সেই সময়ের যুবসমাজের আত্মবলিদান ও মাতৃভূমির মুক্তিসংগ্রামের গৌরবগাথা আর কোন কবি রচনা করেননি।”

১৯১৭ সালে, স্কুলের পড়া শেষ না করেই, ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে সৈনিকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। করাচিতে ব্যারাকে অবস্থানকালে সোভিয়েত বিপ্লবের সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছায়। নভেম্বর বিপ্লবের উদ্দেশ্য এবং বিপ্লবের পর সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ইত্যাদির কথাও তিনি জানতে পারেন। বিপ্লবের তাৎপর্য তিনি উপলব্ধি করেন এবং উৎসাহিত ও প্রভাবিত হন। সেখানে তিনি ফার্সিভাষা শিখে হাফিজের গ্রন্থ পাঠ করেন। সঙ্গীত অনুশীলনের সুযোগ পান। সেনানিবাসেই শুরু করেন-‘বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী’,‘রিক্তের বেদন’ ও ‘বাঁধন হারা’ রচনা।

১৯২০ সালে রেজিমেন্ট ভেঙ্গে দেওয়ার পর তিনি করাচি থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে। কলকাতায় ফিরে মুজফ্ফর আহমেদের সঙ্গে বসবাসের সুবাদে উভয়ের সম্পর্ক গভীরতর হয়।

গণজাগরণের অভীত চারণ মেতে উঠলেন ‘সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।’ ‘আনোয়ার’ ও ‘কামালপাশা’র পর ১৯২১ সালের ডিসেম্বরের শেষে তালতলা লেনের বাসায় (যেখানে কাকাবাবুর সঙ্গে একসঙ্গে থাকতেন) রচনা করলেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা ‘বিদ্রোহী’। ঝড় তুলে দিল মানুষের চেতনায়, বাংলা সাহিত্যের আঙিনায়, রক্ষণশীল শিবিরে এবং অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকের অন্দর মহলে--- এই একটা কবিতা। কবিতার মধ্যে যে এত পৌরুষ, এত বীর্যবত্তা, প্রচলিত সামাজিক অসম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এত স্পষ্ট এবং সোচ্চার প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে পারে (ব্যতিক্রম ‘বলাকা’), বাংলা কবিতায় এর আগে কোনো নজির নেই। “অত্যাচারীর বিরুদ্ধে এমন অগ্নিময়ী ভাষায় আর কোনো বাঙালি কবি চ্যালেঞ্জ জানান নি। সমাজের উৎপীড়নে এমন শপথ আর কারো মুখে তো শুনিনি।” বাঙালির শিরায় বয়ে গেল তরল অনল। ‘গেল গেল’ রবও তোলা হল কোমর বেঁধে। ‘শনিবারের চিঠি’ নজরুলকে কুৎসিতভাবে আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছিল।

বিপরীতে প্রখর তেজে দেদীপ্যমান কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী চোখে দেখেছিলেন এই কবিতাকে? একটা ঘটনার উল্লেখ করলে তা বোঝা যাবে। ১৯২২ সালে ১৫ জানুয়ারি নজরুল জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের কাছে যান। সেখানে গিয়ে ‘গুরুজি গুরুজি’ বলে চিৎকার করতে থাকেন। ওপর থেকে রবীন্দ্রনাথ বললেন কি কাজী অমন ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন? কী হয়েছে? নজরুল বললেন আপনাকে হত্যা করব গুরুজি, গুরুজি আপনাকে হত্যা করব। রবীন্দ্রনাথ বললেন হত্যা করব, হত্যা করব কি, ওপরে এসে বোসো। ওপরে গিয়ে

বললেন—হ্যাঁ সত্যি বলছি, আপনাকে হত্যা করব। বসুন, শুনুন, কাজী 'বিদ্রোহী' কবিতাটা তাঁকে শুনিয়ে দিলেন। তিনি স্তব্ধ বিস্ময়ে কাজীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে কাজীকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন, বললেন হ্যাঁ, কাজী সত্যি তুমি আমাকে হত্যা করবে।

এছাড়া লাগামহীন নজরুলবিরোধীতার উপযুক্ত জবাবও দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেছিলেন, ''নজরুল ইসলাম জাতির জীবনে বসন্ত এনেছে।''

বিদ্রোহী কবিতা প্রথমে 'বিজলী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের অন্যান্য কবিতা —প্রলয়োল্লাস, বিদ্রোহী, রক্তাম্বর, ধারিণী মা , আগমনী, ধুমকেতু, কামালপাশা, আনোয়ার, রণভেরী, মাত-ইল-আরব, খেয়াপারের তরণী ইত্যাদি।

অগ্নিবীণার প্রথম কবিতা 'প্রলয়োল্লাস'। নভেম্বর বিপ্লব পৃথিবীতে যে নতুন যুগের সূচনা ঘটিয়েছিল, অসাম্যের অবসান ঘটিয়ে সুষম সমাজ গড়ার যে ভিত্তি রচনা করেছিল তার প্রভাব নজরুলের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। নিজের দেশের মাটিতে এই নবযুগ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে মানুষকে ডাক দিয়ে বললেন—

তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।।
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল-বোশেখীর ঝড়!

সমাজ থেকে অসুন্দরকে দূর করে নতুনকে প্রতিষ্ঠা করাই বিপ্লবের ধর্ম। বিপ্লব ধ্বংস নয় সৃষ্টি, মৃত্যু নয় জীবন। জীবনকে, সৃষ্টিকে প্রতি দেশের বুকে বাস্তবায়িত করার আহ্বান জানিয়ে দেশবাসীকে বললেন—

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?
প্রলয় নতুন-সৃজন-বেদন
আসছে নবীন-জীবনহারা অসুন্দরে করতে ছেদন।
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আসছে হেসে—
মধুর হেসে।
ভেঙ্গে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।

'ধুমকেতু' নজরুলের এক অনবদ্য সৃষ্টি। তৎকালীন সময়ে তো বটেই—এ যুগেও এর জুড়ি মেলা ভার। এই কবিতায় মানববুদ্ধির অপরাজেয় অভিযানের অহংকার ব্যক্ত হয়েছে স্পষ্ট ভাষায়। দৃপ্ত উচ্চারণে ঘোষিত হ'ল—

আজিও ব্যথিত সৃষ্টির বুকে ভগবান কাঁপে ত্রাসে
স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টি পাছে বা বড় হয়ে যায় তার গ্রাসে।

'কামাল পাশা' কবিতায় 'বিপ্লব স্পন্দিত বুকে' নজরুল তুরস্কে কামাল পাশার নেতৃত্বে যাবতীয় রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে সফল বিপ্লবের প্রশংসায় সানন্দে উচ্চারণ করলেন—

ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই
কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল, তুনে কামাল কিয়া ভাই!

সাম্রাজ্যবাদী চণ্ডনীতির বিরুদ্ধে অপরিমিত ঘৃণায় তার চরিত্র উদ্ঘাটন করে তিনি লেখনী শানালেন—

পরের মুলুক লুট করে খায় ডাকাত তারা ডাকাত
তাই তাদের তরে বরাদ্দ ভাই আঘাত শুধু আঘাত।....
হিংস্র ওরা হিংস্র পশুর দল।...
জালিম ওরা অত্যাচারী
সার জেনেছে সত্য যাহা হত্যা তারই
জালিম ওরা অত্যাচারী।.....

সাম্রাজ্যবাদ শাসিত উপনিবেশের মানুষ হয়েও সাম্রাজ্যবাদীকে 'ডাকাত' হিসেবে চিহ্নিত করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা ছিলনা সিংহহৃদয় নজরুলের। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এত ঋজু, এত স্পষ্ট, এত নিঃশঙ্ক উচ্চারণ সর্বকালের বাংলা কবিতায় আক্ষরিক অর্থেই দুর্লভ। সমগ্র হৃদয়জুড়ে বিপ্লবের স্পন্দন অনুভব না করলে এ ধরনের স্পর্ধিত উচ্চারণ সম্ভব নয়।

'বিষের বাঁশী' কাব্য গ্রন্থ ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয় এবং ওই বছরের অক্টোবর মাসেই গ্রন্থটি বিট্রিশ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। বিষের বাঁশী শুধু স্বদেশ-মন্ত্র নয়, এর সব গানই 'অভয়-মন্ত্র', সব গানই 'সত্য-মন্ত্র'। এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'জাতের বজ্জাতি', 'সত্য-মন্ত্র', 'শিকল পরার গান', 'মরণ-বরণ' প্রভৃতিতে সোচ্চারে উচ্চারিত হয়েছে অপরাজেয় আশাবাদ, বীর-বাণী।

'সত্য-মন্ত্র' কতিায় মানব বিধানকে উচ্চাসনে বসিয়ে লিখলেন—

পুঁথির বিধান যাক্ পুড়ে তোর,
বিধির বিধান সত্য হোক।
বিধির বিধান সত্য হোক।

আরও বললেন—

মনু ঋষি অনু সমান বিপুল বিশ্বের যে বিধির।
বুঝলি না সেই বিধির বিধি, মনুর পায়েই নোয়াস শির।

ওরে মুর্খ, ওরে জড়
শাস্ত্র চেয়ে সত্য বড়।

'প্রবাসী'র মত অভিজাত পত্রিকাকেও স্বীকার করতে হল ঃ 'কবিতাগুলি যেন আগ্নেয়গিরি, প্লাবন ও ঝড়ে প্রচণ্ড রূপ রুদ্র ধরিয়া বিদ্রোহী কবির মর্মজ্বালা প্রকটিত করিয়াছে। জাতির এই দুর্দিনে মুমূর্ষু নিপীড়িত দেশবাসীকে নবীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিবে।'

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সেনানীদের অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত করার লক্ষ্যে 'শিকল পরার গান'এ কম্বুনাদে তিনি ঘোষণা করলেন—

এই শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল।
... ...
তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুঁটি ধরব টিপে করব তারে লয়,
মোরা আপনি ম'রে মরার দেশে আন্‌ব বরাভয়,
মোরা ফাঁসি ম'রে আন্‌ব হাসি মৃত্যু-জয়ের ফল।।
ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল-ঝঞ্ঝনা
এযে মুক্তি পথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা!
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল।।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে হুগলি জেলে বন্দী থাকা কালে তিনি নিয়মিত গান আবৃত্তির আসর বসাতেন। এই গান রাজনৈতিক বন্দীদের তো বটেই, সাধারণ কয়েদিদেরও দারুণ ভাবে উজ্জীবিত করত।

'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত দাস, নজরুলের একজন কঠোর সমালোচকও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন জাতীয় জাগরণের সহায়ক হিসেবে এই গ্রন্থের প্রচার ও প্রসার একান্ত আবশ্যক।

বলাবাহুল্য ইংরেজ সরকারের পক্ষে এই গ্রন্থ নিষিদ্ধ না করে উপায় ছিল না।

'ভাঙ্গার গান' প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে এবং এটিও নিষিদ্ধ হয় ওই বছরের ১১ নভেম্বর। এই সংকলনের প্রথম কবিতা—'কারার ঐ লৌহকপাট'—সংগ্রামের আবেগ কম্পিত। এই গানের সুতীব্র মর্মভেদী আবেদন শুধু বাংলা বা ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের সেনানীদের প্রবলভাবে উজ্জীবিত করেছিল তাই নয়—এই গানের হৃদয় উদ্বেল করা আহ্বান ভূগোলের বেড়া ভেঙ্গে কালের সীমাকে অতিক্রম করে আজও পৃথিবীর দেশে দেশে শোষণ বঞ্চনা অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইকে, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করার সংগ্রামকে প্রেরণা যুগিয়ে চলেছে। নজরুলের অনবদ্য এই সৃষ্টির অমিত বিক্রম চিরন্তন। এ গান দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষের শৃঙ্খল মোচনের কোরাস সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে।

'প্রিন্স অব ওয়েলস' ভারত ভ্রমণে আসার কারণে একদিকে যেমন বিক্ষোভ দানা বাঁধে, অপরদিকে কিছু ইংরেজ ধামাধরা পুলকিত হয়। এই দ্বিতীয় পংক্তির মানুষদের উদ্দেশ্যে তাঁর ব্যাঙ্গোক্তি—

লক্ষ্য যাদের উৎপীড়ন আর অত্যাচার
নর-নারায়ণে হানে পদাঘাত
জেনেছে সত্য-হত্যা মার!
ত্রিশ কোটি নর-আত্মার যারা অপমান হেলা
করছে রে—
শৃঙ্খল গলে দিয়েছে মা'র
যে আজ ভগবান তোমার।

ধর্মপ্রাণ কিন্তু আদ্যন্ত অসাম্প্রদায়িক নজরুল দেশে হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিভেদে ক্ষুব্ধ, বিচলিত এবং ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এই অনৈক্য স্বাধীনতা সংগ্রামকে দুর্বল করছে। আর কৌশলী ইংরেজ এই অনৈক্যকে ব্যবহার করে ঔপনিবেশিক শাসনকে দীর্ঘায়িত রাখার সুযোগ পাচ্ছে। তাই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের আবেদন জানিয়ে 'মিলনের গান'এ তিনি লিখলেন—

ভাই হয়ে ভাই চিন্‌বি আবার গাইব কি আর এমন গান।
(সেদিন) দুয়ার ভেঙ্গে আস্‌বে জোয়ার মরা গাঙে
ডাকবে বান।।
(তোরা) স্বার্থ-পিশাচ যেমন কুকুর তেমনি মুগুর পাস রে মান।
তিনি শেষ করেছেন এই বলে—
(তোরা) করলি কেবল অহরহ নীচ কলহের গরল পান।
(আজো) বুঝলি না হায় নাড়ী-ছেঁড়া মায়ের পেটের ভায়ের
টান।
(ঐ) বিশ্ব ছিঁড়ে আন্‌তে পারি, পাই যদি ভাই
তোদের প্রাণ।।
(তোরা) মেঘ বাদলের বজ্রবিষাণ (আর) ঝড় তুফানের লাল
নিশান।

দ্ব্যর্থবোধক 'দুঃশাসনের রক্তপান' এই গ্রন্থের অন্যতম একটা কবিতা। দুঃশাসনের সঙ্গে ইংরেজের তুলনা করে তিনি লিখলেন,

বল রে বণ্য হিংস্র বীর
দুঃশাসনের চাই রুধির!

... ...
ওরে এ যে সেই দুঃশাসন
দিল শত বীরে নির্বাসন,
কচি শিশু বেঁধে বেত্রাঘাত
করেছে রে এই ক্রুর স্যাঙাত।
মা বোনেদের হয়েছে লাজ
দিনের আলোকে এই পিশাচ।
... ...
তারে ক্ষমা করা? ভীরুতা সে!

'সাম্যবাদী' প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে। নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব এবং মুজফ্‌ফর আহমেদের সঙ্গে বহুদিন একত্রে থাকার সুবাদে তিনি গভীরভাবে সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। প্রচলিত সমাজব্যবস্থার অনাচার অসঙ্গতি তাঁকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। তার ফলে তাঁর মধ্যে শ্রেণি-চেতনার বিকাশ ঘটেছিল। সে কারণে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বিপ্লবের মাধ্যমে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত না হলে অসাম্যের অবসান ঘটবে না। সাম্যবাদ ছাড়া নিপীড়িত মানুষের মুক্তি নেই। এই সামগ্রিকতার ফসল সাম্যবাদীর কবিতাগুচ্ছ এবং পরবর্তীকালে 'সর্বহারা', 'ফণি মনসা', 'প্রলয়-শিখা' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থসমূহ।

এখানে একটা বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। মুজফ্‌ফর আহমেদের ইচ্ছায় এবং তাঁর বিশেষ প্রচেষ্টায় 'আন্তর্জাতিক সঙ্গীত'-এর ইংরেজি অনুবাদ সংগৃহীত হলে নজরুল ইসলাম সেই গানের বাংলা তর্জমা করে সুরারোপ করেন—সৃষ্টি হয় 'অন্তর-ন্যাশনাল-সঙ্গীত'

জাগো—
জাগো অনশন-বন্দী, ওঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত!
যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি'
হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন-মথিত বাণী,
নব জনম লভি অভিনব ধরনী
ওরে ওই আগত।।

নজরুল ইসলামই বাংলার সঙ্গীত জগতে 'আন্তর্জাতিক সঙ্গীত' এর প্রথম অনুবাদক। নিজের মধ্যে শ্রেণি চেতনার বিকাশ না ঘটলে শুধুমাত্র মুজফ্‌ফর আহমেদের ইচ্ছায় তিনি এই বিশ্ববিখ্যাত গানের অনুবাদ এবং তাতে সুরারোপের তাগিদ অনুভব করতেন না।

সাম্যবাদী গ্রন্থের প্রথম কবিতা সর্বহারা। এই কবিতাতে তিনি সর্বহারাদের আহ্বান জানিয়েছেন মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে। তিনি লিখলেন—

মাঝিরে, তোর নাও ভাসিয়ে
মাটির বুকে চল্‌।
শক্ত মাটির ঘায়ে হউক
রক্ত পদতল।

শ্রমিকদের ডাক দিয়ে বললেন—

ওরে ধ্বংস পথের যাত্রী দল
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল।।
আমরা হাতের সুখে গড়েছি তাই,
গায়ের সুখে ভাঙব বল।
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল।।
চাষীদের সম্বোধন করে বললেন—
ওঠরে চাষী জগদ্বাসী ধর কসে লাঙ্গাল
আমরা মরতে আছি—ভাল ক'রেই মরব এবার চল্‌।
মোদের উঠান-ভরা শস্য ছিল হাস্য ভরা দেশ,
ঐ বৈশ্য বেশে দস্যু এসে লাঞ্ছনার নাই শেষ!

কবি বুঝেছিলেন সমাজে বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জাগ্রত চেতনায় সমৃদ্ধ শ্রমিক-কৃষকই মূল শক্তি।

বাংলা কবিতায় এই নতুন ভাবনার প্রকাশ হয়েছিল নজরুলের সাহসী লেখনী থেকেই।

গণচেতনার দুর্জয় ভাষ্যকার নজরুলের অন্যতম জাগরী কাব্যগ্রন্থ 'সর্বহারা' প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে। এমন উদাত্ত, বলিষ্ঠ, প্রেরণা সঞ্চারকারী কাব্যগ্রন্থ বাংলা কবিতার অঙ্গনে বিরল বললে অত্যুক্তি হবে না। গ্রন্থের প্রতিটি কবিতায় বক্তব্যের বলিষ্ঠতা, ভাষার ওজস্বিতা, প্রকাশভঙ্গী, মানুষকে সংগ্রামমুখী করার অনন্য ক্ষমতা বিস্ময়কর।

এর প্রথম কবিতা 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'। "কবিতাটির জন্মলগ্নে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের বাতাবরণ অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ, ভ্রাতৃবিচ্ছেদজনিত বেদনার রক্তে ইতিহাস কলঙ্কিত।...ইংরেজ শাসক প্রচারিত দ্বিজাতি তত্ত্বের স্পর্শে জাতীয় জীবনে সূচনা হয় ভ্রাতৃবিচ্ছেদের রক্তাক্ত অধ্যায়।" কোন্‌ পথে আসবে স্বাধীনতা—বিপ্লববাদ না গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন—এ সম্পর্কে জাতি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব- সংশয়পীড়িত। জাতির প্রতিনিধি হিসেবে জাতির এই চরম দুর্দিনে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনকারীদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। কবিতাতে সুরারোপ করে সঙ্গীত হিসেবে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এবং প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। কবিতায় দেশের তৎকালীন বাস্তব অবস্থার চিত্রকল্প ফুটিয়ে তুলেছেন— সুনিপুণভাবে—

দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার।
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশিথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!

দ্বিধা-দ্বন্দ্ব জর্জরিত দেশ-সমুদ্র আজ বিক্ষুব্ধ। এই বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে কাণ্ডারী অর্থাৎ নেতৃত্বের কাছে তাঁর আবেদন—

কাণ্ডারী তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ মাঝ?
করে হানাহানি, তবু চলো টানি নিয়াছ যে মহাভার।

এই গান সম্পর্কে কবির সম্বর্ধনাসভায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন—"আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্বদাই ঘুরে বেড়াই। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত শোনবার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'র মতো প্রাণ মাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয়না।"

বুদ্ধদেব বসুর মতে, "দুর্গম গিরি কান্তার মরু উৎকর্ষের শিখর স্পর্শী।"

বর্তমান সময়ের পরিস্থিতির বিবেচনায় এ গান আজও সমানভাবে প্রযোজ্য। সে কারণেই বিভিন্ন সভাসমিতি, সম্মেলনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে এই গান বা কবিতা।

রাজনৈতিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন যুগের হাওয়া বইয়ে দিয়েছিলেন নজরুল ইসলাম। 'সর্বহারা', 'সাম্যবাদী' নামকরণেই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এদের ভাবসত্যের মধ্যে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব খুবই স্পষ্ট। 'সর্বহারা' কবিতায় উচ্চারিত হল—

ভাঙন-ভরা আগুনে তোর
যায় রে বেলা যায়।
মাঝি রে! দেখ ফুরঙ্গী তোর
ফুলের পানে চায়।
যায় চলে যায় ঐ সাথের সাথী,
ঘনায় গহন শাওন-রাতি,
মাদুর-ভরা কাঁদন পাতি,
ঘুমুসনে আর হায়।
ঐ কাঁদনের বাঁধন ছেঁড়া
এতই কি রে দায়?

পড়ে পড়ে মার খাওয়া নয়। মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সর্বহারা বানানোর যন্ত্রটাকে সমূলে বিনাস করার দৃপ্ত আহ্বান জানিয়ে তাই তিনি বললেন—

প্রলয়-পথিক চল্‌বি ফিরি
দ'ল্‌বি পাহাড় কানন গিরি!
হাঁকছে বাদল, ঘিরি ঘিরি,
নাচছে সিন্ধু জল,
চল্‌রে জলের যাত্রী এবার
মাটির বুকে চল্‌।

কতখানি আধুনিকমনস্ক, মানুষের দুঃখকষ্টে কতখানি ব্যথিত না হলে, নিপীড়িত মানুষের মুক্তি কামনায় কতখানি আন্তরিক না হলে, মানবপ্রেমে কতখানি বিগলিত প্রাণ না হলে একজন কবির লেখনী থেকে এমন অনিন্দ্যসুন্দর দুর্জয় স্রোতধারা প্রবাহিত হতে পারে—

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান।
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ক্রীশ্চান!
গাহি সাম্যের গান।

মানবহিতৈষী কবি নজরুলের সৃষ্টির মধ্যেই সর্বপ্রথম সাম্যবাদ তথা মানবতাবাদ স্ফূরিত ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত হতে দেখা যায়। এখানেই নজরুলের বিদ্রোহী সত্তার সৌরি প্রকাশ। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিশ্বাস, "সে বিদ্রোহের প্রকাশ তরল বাষ্পীয় উচ্ছ্বাসে নয়, মানুষের মূল্য ও মহিমা সম্বন্ধে অটল ধ্রুব অয়স্ফঠিন বিশ্বাসের নির্ভিক স্বীকারোক্তি।"

'ফণি মনসা' (১৯২৭), 'প্রলয়-শিখা' (১৯৩০), 'চন্দ্রবিন্দু' (১৯৩০) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে মানব মুক্তির উজ্জ্বল গাথা ধ্বনিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিমায়।

'সব্যসাচী', 'ফণি-মনসা'র অন্যতম এক কবিতা। মানুষকে অভয়-মন্ত্র দিয়ে বললেন—

ওরে ভয় নাই আর, দুলিয়া উঠিছে হিমালয়-চাপা প্রাচী!
গৌরীশিখরে তুহিন ভেদিয়া জাগিছে সব্যসাচী!
দ্বাপর যুগে মৃত্যু ঠেলিয়া
জাগে মহাযোগী নয়ন মেলিয়া,
মহাভারতের মহাবীর জাগে, বলে 'আমি আসিয়াছি!'
নব-যৌবন-জলতরঙ্গে নাচে রে প্রাচীন প্রাচী!

'প্রলয়-শিখা'—কাব্যগ্রন্থের অন্যতম কবিতা 'প্রলয়-শিখা' কবিতায় নভেম্বর বিপ্লব সারা বিশ্বজুড়ে যে নব অভ্যুদয়ের সূচনা করেছে তারই ছবি এঁকেছেন কবি—

বিশ্ব জুড়িয়া প্রলয়-নাচন লেগেছে
ওই
নাচে নটনাথ কাল-ভৈরব তাথই থই।
যে নৃত্যবেগে ললাট-অগ্নি প্রলয়-শিখা
ছড়ায়ে পড়িল হেরো রে আজিকে
দিগ্‌বিদিক।
সহস্র-ফণা বাসুকির সম বহ্নি সে
শ্বসিয়া ফিরিছে, জরজর ধরা সেই
বিষে।
নবীন রুদ্র আমাদের তনুমনে জাগে
সে প্রলয়শিখা রক্ত-উদায়ারুণ-রাগে।

...   .
মুক্ত ধরনি হইয়াছে আজি বন্দিবাস,
নহে কো তাহার অধীন তাহার থল—
জল-বায়ু নীল আকাশ।
মুক্তি দানিতে এনেছি আমরা দেব—
অভিশাপ দৈত্যত্রাস,
দশদিক জুড়ি জ্বলিয়া উঠেছে প্রলয়—
বহ্নি সর্বনাশ!

উল্লেখ্য যে ‘প্রলয়-শিখা’ এবং ‘চন্দ্রবিন্দু’ কাব্যগ্রন্থ দুটিও ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল।

ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে বাতিঘর দেখে ভরসা জাগে। পথের নিশানা স্থির করতে সাহায্য করে। জাতিভেদ দ্বারা কলঙ্কিত, সাম্প্রদায়িকতার বিষে কলুষিত বাংলা তথা ভারতে নজরুল ইসলাম ছিলেন সেই বাতিঘর। জাতধর্ম এবং সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে উঠে স্বদেশের হিতসাধনে, পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বানে এবং তিরন্তারে তিনি দরদী অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেছিলেন।

দেশবাসীর বিবেকের কাছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষায় রচনা করলেন অনন্য সুষমামণ্ডিত মর্মস্পর্শী এই সঙ্গীত—

মোরা, একই বৃন্তে দুটি কুসুম
হিন্দু মুসলমান
মুসলিম তার নয়নমণি
হিন্দু তাহার প্রাণ।

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার মানসে বাংলা সঙ্গীত জগতে নজরুলই অগ্রপথিক।

১৯২৯ সালে তাঁর সম্বর্ধনা সভায় অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন, “কেউ বলেন আমার বাণী যবন, কেউ বলেন কাফের। আমি বলি ও দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে একজায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশ্যাক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি।” বাস্তববত, তৎকালীন সময়ে হিন্দু মুসলমানের মিলন প্রয়াসী এমন দরদী ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশে লক্ষ্য করা যায়নি।

জাতপাত নিয়ে সমাজের অধঃপতন, উচ্চশ্রেণির মানুষের দ্বারা নিম্নশ্রেণির মানুষের অপমান তাঁর চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তাই তিনি চাবুক হেনে লিখলেন—

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছে জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতে নয়কো মোয়া।
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি ভাবলি এতেই জাতের জান,
তাইতো বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে একশো খান।

স্বাধীনতার বয়েস সত্তর পেরিয়ে গেছে। তবু “এই কালের মধ্যেও হিন্দু মুসলমান, ছোটজাত, বড়জাত ইত্যাদি সামাজিক বৈষম্য রয়ে গেছে।—স্বাধীনতার সুদীর্ঘকালের মধ্যেও নিজেদের ভারতবাসী রূপে পরিচয় না দিয়ে ধর্মের পরিচয় দেওয়া হয়।” বর্তমানে রাষ্ট্রীয় মদতে এই ভেদাভেদ ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে।

কাজী নজরুল ইসলাম বেশ কিছু পত্রপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কখনও যুগ্ম সম্পাদক, কখনও বা স্বয়ং সম্পাদক হিসেবে। প্রতিটি পত্রিকাই নজরুল ইসলামের অগ্নিবর্ষী রচনার গুণে— একদিকে যেমন বাংলা জুড়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলার কাজে বিশেষ সংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল অপরদিকে শাসক ইংরেজের কপালে ভাঁজ চওড়া করতে সক্ষম হয়েছিল।

প্রথম পত্রিকা ছিল সান্ধ্য দৈনিক ‘নবযুগ’। মুজফ্ফর আহমেদ এবং কবি ছিলেন পত্রিকার যুগ্মসম্পাদক। এই পত্রিকায় নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হয়। ‘নবযুগে’ প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন ‘যুগবাণী’ নামে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২২ সালে। সহ্য হয়নি ব্রিটিশ শাসকের। ফলে বাজেয়াপ্ত হয়।

১৯২২ সালে কবি ‘ধুমকেতু’ নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। মুজফ্ফর আহমেদও এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কবিগুরুর প্রিয় পাত্র নজরুলের অনুরোধে সাড়া দিয়ে তিনি যে আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন—

“আয় চলে আয়, রে ধুমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন।
...   .
...   .।”

‘ধুমকেতু’ তার চলার পথ ঘোষণা করল এই বলে—

“সর্বপ্রথম ধুমকেতু ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতা চায়।” স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ‘ধুমকেতু’তেই সর্বপ্রথম ‘পূর্ণ-স্বাধীনতা’র শব্দ উচ্চারিত হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দোর্দণ্ডপ্রতাপের কালে এই ঘোষণা অসীম সাহসের পরিচয় বহন করে। পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জনমানসে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এর জনপ্রিয়তা এত বৃদ্ধি পায় যে সবসময় চাহিদা অনুসারে তা সরবরাহ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

পত্রিকার শারদ সংখ্যায় কবির “আনন্দময়ীর আগমনে” নামে এক দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়।

আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল,
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল,
দেব শিশুদের মারছে চাবুক বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা আসবি কখন সর্বনাশী?

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়। প্রমাদ গোনে ব্রিটিশ সরকার। তারা বহুদিন আগে থেকেই নজরুলকে গ্রেফতার করার সুযোগ খুঁজছিল। ‘‘আনন্দময়ীর আগমনে’ প্রকাশিত হবার পর আর অপেক্ষা করেনি। কবিতা রাজদ্রোহীমূলক বিবেচিত হল। তাঁকে গ্রেফতার করা হল। বিচারে তিনি একবছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। নজরুল ইসলামই একমাত্র কবি, যিনি কবিতা লেখার অপরাধে রাজরোষে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

তাঁর পরিচালনায় ‘লাঙল’ এবং ‘গণবাণী’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল নজরুল ইসলাম পরিচালিত বা সম্পাদিত যত পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল তা সেই সময়ে প্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকার তুলনায় অনেক বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল—শুধুমাত্র তাঁর রচনার অশেষগুণে।

নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে একটা বিষয় উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। সাম্রাজ্যবাদ তথা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আপসহীন যোদ্ধা। মানবতার এই শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি ক্ষুরধার আক্রমণ শানিয়েছেন একেবারে খোলাখুলিভাবে। কোনো আড়াল আবডাল খোঁজেননি। ফলে স্বাভাবিক কারণেই রাজরোষ আছড়ে পড়েছিল তাঁর ওপর। ‘বিদ্রোহী’ প্রকাশিত হবার পর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। এক এক করে তাঁর মোট আটটি বই বাজেয়াপ্ত করা হয়।

এ কথা ঠিকই যে সেই সময়ে অনেক লেখকের বইই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। কিন্তু শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতে নজরুল ইসলামের বাজেয়াপ্ত করা বই-এর সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক।

এখানে একটা বিষয়ের অবতারণা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর অগ্নিবর্ষী রচনাসমূহের কারণে রাজরোষে আক্রান্ত হওয়াটা কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে তিনি সেই সময়ের বাংলা সাহিত্যের অনেক রথী মহারথীর দ্বারা নির্দয়ভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন। আরও বেদনার কারণ, তাঁর পরমশ্রদ্ধেয় গুরুজি—রবিঠাকুরও নিন্দা-কোরাসে কণ্ঠ মিলিয়ে ছিলেন। বেদনাতুর নজরুল তাই বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—‘‘পুলিশের জুলুম আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। তাদের জুলুমের তবু একটা সীমারেখা আছে। কিন্তু সাহিত্যিক যদি জুলুম করতে শুরু করেন তার আর পারাপার নেই। এরা তখন হয়ে ওঠে টিক্‌টিকি পুলিশের চেয়েও ক্রুর, অভদ্র। যেন চাক-ভাঙ্গা ভীমরুল। জলে ডুবেও নিষ্কৃতি নেই, সেখানে গিয়েও দংশন করবে।’’ সখেদে, গভীর মর্মবেদনায় তাই তিনি বলেছিলেন, ‘‘আজ তাই একটিমাত্র প্রার্থনা, যদি পরজন্ম থাকেই তবে আর যেন এদেশে কবি হয়ে না জন্মাই, বরং শরৎচন্দ্রের মঠের কুকুর হয়েই আসি। নিশ্চিন্তে দুমুঠো খেয়ে বাঁচবো।’’ তবু আমাদের সৌভাগ্য এটাই যে ঘরে বাইরের এই নিষ্ঠুরতায় ভারাক্রান্ত হয়েছিল তাঁর হৃদয়। কিন্তু তাঁর পিঠে অস্ত্র-আঘাতের চিহ্ন ছিলনা।

বিদগ্ধ সাহিত্য সমালোচক আতাউর রহমান অত্যন্ত সঠিক ভাবেই নজরুলের মূল্যায়ন করে বলেছেন, ‘‘নজরুলের বাণী বিশ্বাসের বাণী—জীবনের মহৎ মূল্যে আস্থার বাণী। সমাজকে ভেঙ্গে গড়বার স্বপ্ন ও উদ্যম ছিল তাঁর ক্লান্তিহীন।’’

স্বদেশপ্রেম তাঁর কাছে কোনো দেখনাই সৌখিন বস্তু ছিল না। তাঁর প্রতিটি রক্তবিন্দুতে প্রবাহিত ছিল নিখাদ স্বদেশপ্রেম। সেই কারণেই পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনে তিনি ছিলেন অসমসাহসী যোদ্ধা। অপরদিকে সমাজকে ক্লেদমুক্ত করে তাকে মানুষের বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার কাজে তিনি ছিলেন অগ্নিহোত্রী ঋষি। তাঁর নিজের কথায়, ‘‘বিংশ শতাব্দির অসম্ভবের যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরই অভিযান-সেনা দলের তূর্য-বাদক আমি—এই হোক আমার সবচেয়ে বড়ো পরিচয়। আমি জানি এই পথ-যাত্রার পাকে-পাকে বাঁকে বাঁকে কুটিল-ফণা ভূজঙ্গ, প্রখর দর্শন শার্দুল পশুরাজের ভ্রূকুটি এবং তাদের নখর দংশনের ক্ষত আজও আমার অঙ্গে অঙ্গে। তবু ওই আমার পথ, ওই আমার গতি, ওই আমার ধ্রুব।’’

রুদ্ররূপী নজরুলের উগ্র-স্নিগ্ধ অনির্বাণ দীপ্তি, মুক্তি ছিনিয়ে আনার, সুষম-সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার সংগ্রামে চিরন্তন উজ্জ্বল আলোক বর্তিকা।

তথ্যসূত্র :

১. কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা—মুজফ্‌ফর আহমেদ
২. জনগণের কবি নজরুল ইসলাম—কল্পতরু সেনগুপ্ত
৩. নজরুলের প্রবন্ধ সংগ্রহ
৪. নজরুল ইসলাম—কবিমানস ও কবিতা—ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়
৫. সঞ্চিতা—নজরুল ইসলাম
৬. নজরুল কাব্য সমীক্ষা—আতাউর রহমান
৭. কাজী নজরুল—প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়
৮. নজরুলের নানাদিক—তিতাস চৌধুরি
৯. নিষিদ্ধ নজরুল—শিশির কর
১০. নজরুল বিচিত্রা—সম্পাদনা—কাজী সব্যসাচী, কাজী অনিরুদ্ধ, বিশ্বনাথ দে

কর্মবীর মহাপ্রাণ রামমোহন

পাঁচুগোপাল মারিক

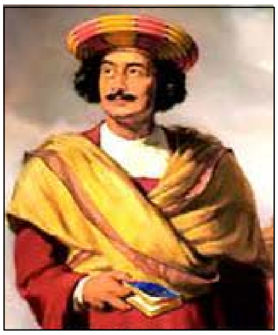

‘Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful’ অর্থাৎ ‘স্বাধীনতার শত্রু এবং অত্যাচারের বন্ধুরা কখনোই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করতে পারেনি ---কখনো পারবেও না’ এই ছিল রামমোহন রায়ের জীবন বেদ।

যেখানে পীড়িতের কান্না—সেখানেই রামমোহন। যেখানে অন্যায়---সেখানেই বজ্রপাণি রামমোহন। স্বদেশেই হোক বিদেশেই হোক। তিনি তো কেবল বাঙালিরই নন। সারা ভারতবর্ষের তিনি—সারা পৃথিবীর।

সাম্য, স্বাধীনতা আর ভ্রাতৃত্বের মন্ত্রে যে বিরাট ফরাসী বিপ্লব ঘটে গেছে—রামমোহন দিনের পর দিন তার সংবাদের জন্যে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করেন। জনগণের জয়ের সংবাদে আনন্দে আশায় তাঁর বুক ভরে ওঠে। তিনি স্বপ্ন দেখেন, কবে তাঁর দেশের মানুষও ফ্রান্সের বিপ্লবী জনতার মতো মুক্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠবে, মাসেই! কবে আমাদের দেশেও চূর্ণ হয়ে যাবে বাস্তিলের কারাগার।

প্রসঙ্গাতঃ উল্লেখ করা গেল মধ্যকালের সেরা বুদ্ধিজীবী কার্ল মার্কসের একটি উক্তি, ‘ভারতীয় অধিবাসীদের মধ্যে থেকেই অনিহা সত্ত্বেও বেছে বেছে যে সব লোককে ইংরেজের তত্ত্বাবধানে কলকাতায় শিল্প দেওয়া হয়েছে, তাদেরই মধ্য থেকে একটা শ্রেণী গড়ে উঠেছে—যারা গভর্ণমেন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী গুণসম্পন্ন এবং ইউরোপের বিজ্ঞানে জ্ঞানসম্পন্ন।’

ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এই আধুনিক অভিজাত শ্রেণির লোকেদের মধ্যে এসেছিল পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল চিন্তাধারা যার ফলে সামন্তবাদী মধ্যযুগীয় প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারার ভিত্তি নড়ে গিয়েছিল। আধুনিক যুক্তিবাদে বিশ্বাসী এই প্রগতিশীল অভিজাত শ্রেণির প্রতিনিধি রামমোহন রায় ছিলেন বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎ। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় ‘‘খ্রিস্টীয় ১৮১৩ অব্দ হইতে ১৮৩৩ সাল অব্দ পর্যন্ত মোটামুটি কুড়ি বৎসর রামমোহন বাংলাদেশের নব্য প্রাণ প্রতীতির দিব্য দীপশিখা বহন করিয়া চলিয়াছিলেন---ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে এই আধুনিক প্রমিথ্যুস সর্ববিধ বন্ধন আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন।’’

এই মহাত্মা যুগন্ধর পুরুষের আবির্ভাবের পূর্বে যে বাংলার চিত্র আমরা পাই, তা ছিল আপাদমস্তক জড়তাগ্রস্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন তিমিরাচ্ছন্ন এক দেশ, যুক্তিবিহীন মূঢ় লোকাচার ও প্রথার দাসত্বে সেকালের লোকদের বিচারবুদ্ধি এতটাই আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, চরম নির্দয়তা সম্বন্ধেও তাদের অনুভূতিতে কোনো সায় ছিল না, গঙ্গাসাগরে শিশু সন্তান বিসর্জন, সতীদাহ বা সহমরণ প্রথা, বাল্যবিবাহ বা বহুবিবাহ, বৈধ্যবের যন্ত্রণা ও সমাজে বিধবাদের অসহায়তা, জাতির নিতান্ত অনুন্নত ও ভাগ্যহত, অবস্থা—এসব এবং এই জাতীয় আরও সব মর্মান্তিক ঘটনায় সমাজের বিবেক এতটুকু নাড়া খেত না, এমনি ছিল তখনকার সমাজের সর্বব্যাপী অন্ধকারের রূপ। রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর এই দুই দিকপাল মনীষী ও কৃতকর্মা ব্যক্তির কৃতিত্ব এখানে যে, তাঁরা দুজনে যথাক্রমে ঊনিশ শতকের প্রারম্ভিক ও মধ্যপর্বে বাংলার জনজীবনে আর্বিভূত হয়ে তৎকালীন সমাজ দেহটাকে এমন প্রচণ্ড শক্তিতে ঘা দিয়েছিলেন যে, সমাজ সেই আঘাতের বেদনায় তার পূর্বতন অন্ধকার ঘুমে আচ্ছন্ন জাড্যকবলিত নিশ্চেতন অবস্থা থেকে হঠাৎ সম্বিৎ পেয়ে জেগে ওঠে এবং চোখ মেলে তাকায়। এই জাগরণের নামই ‘নবজাগরণ’ এবং তারই ধারা বেয়ে বাঙালি জাতির ভিতর একে একে বিবিধ সংস্কার আন্দোলনের উদ্ভব। ইতিহাসের কালানুক্রমিক বিচার করলে রামমোহনকে বলা যায় ‘নবজাগরণের ভগীরথ’, আর বিদ্যাসাগর হলেন তারপরের পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কর্মকারক পুরুষ, যাঁর অমিতবিক্রম প্রচেষ্টায় নবজাগরণের স্রোতসমূহ বেগ ও বিশালতা লাভ করেছিল। এঁরাই পথিকৃৎ, অন্যান্যরা সূত্রধার।

স্ত্রী জাতির ওপর আচরিত একাধিক দীর্ঘদিনের নিষ্ঠুর প্রথার অবসান, তাঁদের মধ্যে শিক্ষার প্রবর্তন ও শিক্ষার বিস্তার, তাঁদের অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য কিছু কিছু সদুদ্দেশ্যমূলক প্রয়াস মাতৃমঙ্গাল ও শিশুকল্যাণ— প্রধানত এই কটি লক্ষ্য ঘিরে তদানীন্তন নারী আন্দোলনগুলি পরিচালিত হচ্ছিল, অন্য অনেক বিষয়ের মতো এই বিষয়ে ছিল নবযুগের স্রষ্টা রামমোহনের ভূমিকা সবচেয়ে অগ্রণী ও বলিষ্ঠ।

মাত্র পনেরো বছর বয়সে পরিবার থেকে বিতাড়িত হয়ে সত্যের সন্ধান করতে বেরিয়ে পড়েন রামমোহন। ভারতবর্ষ ঘুরে দেখলেন, কী শোচনীয় কুসংস্কার কী মূঢ়তা! এক-একজন

কুলীন তিনশো-চারশো করে বিয়ে করে, একটি কুলীন যখন মারা যায়—তখন ছ'মাসের মেয়ে থেকে ছিয়াশি বছরের বুড়ি পর্যন্ত একসঙ্গে বিধবা হয়। রামমোহন বুঝলেন, এ জিনিস চলতে দেওয়া যায় না। তাই ঝাঁপিয়ে পড়লেন সতীদাহ প্রথা-লোপ করতে। তাঁরই মরণপণ প্রচেষ্টায় অবেশেষে ১৮২৯ সালের ৪ঠা মতান্তরে ৭ই ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয়ে আইন বলবৎ হয়।

রামমোহনের মনোস্বিতার প্রাখর্য, বিদ্যার বহুমুখিনতা, বিশ্বজনীনতা ও ক্ষুরধার রাজনীতি বোধ তাঁকে স্ত্রীজাতির প্রতি নানাবিধ অন্যায় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছিল—যার মধ্যে সতীদাহ বা সহমরণ প্রথা রদ অন্যতম। কেমন ছিল সতীদাহের নৃশংসতা?

“....... স্বামীর মৃত্যুর পরই তাহার বিধবাকে এক বাটি সিদ্ধি খাওয়াইয়া ও ধতুরা পান করাইয়া মাতাল করিয়া দেওয়া হইত। শ্মশানের পথে কখনো বা সে হাসিত, কখনো কাঁদিত, কখনো বা পথের মধ্যেই ঢুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িতে চাহিত। সহমৃতা ব্রত পালনে কোনো ছাড় নেই। তারপর চিতায় বসাইয়া কাঁচা বা বাঁশের মাচা বুনিয়া চাপিয়া ধরা হইত। পাছে সতীদাহের যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারে, এত ধুনা আর ঘি ছড়াইয়া অন্ধকার ধোঁয়া করা হইত যে, কেহ তাহার যন্ত্রণা দেখিয়া যেন ভয় না পায়! এবং এত রাজ্যের ঢাক কাঁসি ও শাঁখ সজোরে বাজানো হইত যে, কেহ যেন তাহার চিৎকার, কান্না বা অনুনয় বিনয় না শোনে? এই তো সহমরণ!”

এই 'সহমহণ' বা 'সতীদাহ' কথাটা শোনামাত্রই রাজা রামমোহন রায়ের নাম মনে আসে। কারণ এই ভয়ঙ্কর অমানুষিক প্রথা নিবারণে রামমোহনই সবচেয়ে অগ্রণী হয়েছিলেন। আর রামমোহনের সমস্ত কীর্তির মধ্যে এটাই সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল অক্ষরে ইতিহাসে লেখা থাকবে।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ করা গেল। রামমোহনের দাদা জগমোহন রায়ের স্ত্রী অলকমণি দেবী। এই বৌদিকে রামমোহন অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। জগমোহন অকালে মারা গেলেন। আর তাঁর সঙ্গে সতী হলেন অলকমণি। জানা যায়, অলকমনি সতী হতে চাননি। কিন্তু ধর্মের নামে রাক্ষস সমাজ তাঁকে জোর করে স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারে। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বীভৎসভাবে আর একটি নারীকে হত্যা করা হল।

রামমোহন নাকি বৌদিকে বাঁচাবার জন্য ছুটে এসেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি এসে পৌঁছুলেন, তখন সব শেষ হয়ে গেছে। ঢাকের শব্দে, ধুনোর ধোঁয়ায় পৈশাচিক আনন্দে জনতা চিৎকার করছে, জয় সতী অলোকমণির জয়।

বৌদির চিতার পাশে পাথরের মূর্তির মতো এসে দাঁড়ালেন রামমোহন। এক চোখে আগুন, আর এক চোখে জল নিয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন—জীবনের যে কোনো মূল্যে ভারতবর্ষ থেকে নারী হত্যার এই পৈশাচিক প্রথা তিনি চিরদিনের মতো লোপ করে দেবেন। সেদিনের সেই প্রতিজ্ঞা তিনি পালন করেছিলেন অক্ষরে অক্ষরে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

রামমোহন রায়ের জন্ম ও তাঁর বড়ো হয়ে ওঠা নিয়ে কিছু বলা যাক।

আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগে, ১৭৭৪ সালে, হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে রায়রায়ান রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয়। আনন্দ আহ্লাদের মধ্যে ফুটফুটে ছেলেটির নাম রাখা হয়েছিল রামমোহন।

জমজমাট সংসার। বহুকালের বনেদি জমিদার বংশ— ঐশ্বর্য, খ্যাতি আর প্রতাপের তুলনা নেই। পরম বৈষ্ণব আর ভক্ত পরিবার—বাড়িতে রাজরাজেশ্বরের বিগ্রহ, দুবেলা ঘটা করে সে বিগ্রহের পুজো হয়।

এহেন পরিবারে জন্ম নিয়ে রামমোহনের যে এ-হেন মতিগতি হবে, কে বুঝতে পেরেছিল সে-কথা?

একেবারে ছোটবেলা থেকেই আশ্চর্য মেধাবী রামমোহন। অক্ষর পরিচয়ের সাথে সাথেই পুঁথির দিকে ঝোঁক। রামকান্ত ভাবলেন, এই ছেলেটিকে মানুষের মতো মানুষ করে তুলতে হবে, লেখাপড়া শেখাতে হবে ভালো করে।

পলাশীর যুদ্ধের পর দেশে ইংরেজ সবেমাত্র জাঁকিয়ে বসেছে তখন ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট নয়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তাদের কাজ ভারতবর্ষের নতুন জমিদারি থেকে খাজনা আদায় করা আর ব্যবসা করা।

দেশের শিক্ষাদীক্ষা সবই তখন চলছে পুরোনো রীতিতে, সেই নবাবি আমলে যেমন চলত। অবস্থাপন্ন কিছু পরিবারের ছেলেরা তখন সংস্কৃত আর ফার্সি শিখলেই উচ্চশিক্ষিত বলে গণ্য করা হত তাঁদের।

রামকান্ত ছেলেকে সংস্কৃত শিখতে পাঠালেন কাদীতে। কয়েক বছরের মধ্যেই অদ্ভুত পণ্ডিত হয়ে উঠলেন রামমোহন। তারপর তাঁকে ফার্সি শেখাবার জন্য পাটনায় পাঠালেন রামকান্ত। এত ভালো ফার্সি শিখলেন যে তাঁর নাম হলো 'মৌলভী রামমোহন'।

চৌদ্দ পনেরো বছর বয়সেই অসামান্য পণ্ডিত হয়ে রামমোহন রাধানগরে ফিরে আসেন। শিক্ষার যেটুকু বাকি ছিল তা সম্পূর্ণ হল পালপাড়া গ্রামের বিখ্যাত অধ্যাপক নন্দকুমার কাব্যালংকারের সংস্পর্শে এসে। পরে হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী নামে এই নন্দকুমার বিখ্যাত হয়েছিলেন।

কিন্তু এত বিদ্যা, এত জ্ঞান বুঝি কাল হল রামমোহনের পক্ষে। অন্ততঃ রামকান্ত সেই কথাই ভাবলেন।

দেবদেবীর পুজোয় রামমোহনের আর বিশ্বাস নেই। তাঁর মতে ঈশ্বর এক-অদ্বিতীয়। মাটি পাথরের দেবতাকে পুজো করা মিথ্যে বিড়ম্বনা। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক আর ক্রিশ্চানই হোক এক ঈশ্বরকে যারা নানারূপে দেখে, তারা ভ্রান্ত।

প্রথম প্রথম রামকান্ত ছেলেকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দু'দিনেই বুঝতে পারলেন তাঁর ছেলে দুর্ধর্ষ তার্কিক। তর্কে-বিচারে ছেলের সামনে তিনি দাঁড়াতেই পারতেন না।

রামকান্তের ধৈর্যচ্যুতি হল। তিনি রামমোহনকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করলেন। কিন্তু এতেও নিষ্পত্তি হয় না। পরম বৈষ্ণব রামকান্তের সঙ্গে প্রায় প্রত্যেকদিন রামমোহনের বিরোধ লেগেই থাকত। সংসারের এই অশান্তির ভেতর রামমোহনের মন ক্লান্ত হয়ে উঠল। কিছুদিন পৈতৃক সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের পর আবার একদিন তিনি বেরিয়ে পড়লেন পৃথিবীর পথে। সত্যের সন্ধানে, নিজের ভাগ্য গড়ে তুলবেন নিজের হাতেই।

কিছুকাল পশ্চিমের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন। পাটনা ছাড়িয়ে—কাশী ছাড়িয়ে—আরো দূরে, আরো অনেক দূরে। এই ভ্রমণ তাঁর নিষ্ফল হল না, আরো ভালো করে ভারতবর্ষকে দেখলেন, আরো বিচিত্র অভিজ্ঞতায় চিন্তার ভাণ্ডার ভরে উঠল তাঁর।

যেখানেই যান একই দুর্ভাগ্য, একই কুসংস্কার, একই অন্ধতা। রামমোহনের সঙ্কল্প বজ্রের মতো কঠিন হতে থাকে। এই ভারতবর্ষকে তাঁর বদলাতে হবে—নতুন করে গড়ে দিতে হবে এদেশের অভিশপ্ত মানুষগুলোকে।

এতো গেল চিন্তার দিক, কিন্তু কর্মবীর রামমোহন কাজের দিক থেকেও বসে ছিলেন না। নিজের বুদ্ধি আর উদ্যমের সাহায্যে যথেষ্ট অর্থও উপার্জন করেছিলেন তিনি। দুবছর পরে রামমোহন কলকাতায় এলেন ১৮০১ সালে। এখানেই শুরু করলেন কোম্পানির কাগজের ব্যবসা। কলকাতার সদর দেওয়ানি আদালত আর নতুন গড়ে ওঠা ফোর্টউইলিয়াম কলেজের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল। এই সময় ইংরেজ সিভিলিয়ানদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয়—এদের মধ্যে একজনের নাম জন ডিগবি। আর এই ডিগবির কাছেই রামমোহন ইংরেজি শিক্ষার পাঠ নিয়েছিলেন যার ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতার নানা দিক তাঁর চোখের সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে রামমোহনের বাবা রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হয়। রায় রায়ানদের আদি বাড়ি লাঙ্গুলপাড়ায় রামকান্তের শ্রাদ্ধের আয়োজন হল। বাপের শ্রাদ্ধের জন্যে রামমোহনকে আসতে হল দেশে।

কিন্তু রামমোহনের নতুন ধর্মমত নিয়ে গোলযোগ বাধল। রামমোহনের মা তারিণীদেবী তাঁর নাস্তিক ছেলেকে পিতৃশ্রাদ্ধের অধিকার দিলেন না। এমন কি বিধর্মী সন্তানের মৃত্যুকামনা করতেও দ্বিধা করলেন না।

এতদিন সামান্য বন্ধন ছিল, এবার তাও আর রইল না। একদিকে মায়ের অভিশাপ অন্যদিকে নিজের সত্য। এই দুটিকে মাথায় নিয়ে রামমোহন চিরদিনের মতোই নিজের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। এই সুযোগে রাধানগরের সমাজপতি রামজয় বটব্যাল বিষধর সাপের মতো ফণা তুলল।

রামমোহন নিজের বাড়িতে বসে শাস্ত্র আলোচনা করেন—বই লেখেন। সারা ভারতবর্ষের জন্য সর্বজনীন ধর্মমত গড়ে দেবেন—হিন্দু-বৌদ্ধ-ক্রিশ্চান-মুসলমান সকলকে এক করে দেবেন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্ মন্ত্রে'। এত বড়ো অনাচার সইবে কেন গোঁড়া সমাজপতি রামজয় বটব্যালেরা?

নানা উৎপাত শুরু হল রামমোহনের বাড়িতে। রাত-দিন ঢিল পড়ছে—পড়ছে গোরুর হাড়। তাঁর নামে কদর্য ভাষায় গান রচনা করে দলে দলে তাই গেয়ে বেড়াচ্ছে বাড়ির আশেপাশে।

রামমোহন বুঝলেন গ্রামে বসে নীরব সাধনা তাঁর নয়। তাঁকে একেবারে গোড়া থেকে কাজ শুরু করতে হবে। যেতে হবে বাংলাদেশের প্রাণতীর্থ কলকাতায়। সেখান থেকেই সংগ্রাম শুরু করবেন তিনি। শুরু করবেন তাঁর মহাভারতের সাধনা।

কলকাতায় এসেই রামমোহন তাঁর নতুন সর্বভারতীয় ধর্মমত প্রচারে অগ্রসর হলেন। তাঁর চারদিকে এসে ঘিরে দাঁড়াল অসংখ্য অনুরাগীর দল, এঁদের মধ্যে ছিলেন ছাত্রবন্ধু ভারতপ্রেমিক ডেভিড হেয়ার, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দা দ্বারকানাথ ঠাকুর, টাকির জমিদার কালীনাথ রায়চৌধুরী, তেলেনিপাড়ার জমিদার অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্রিশ্চান পাদরি অ্যাডাম, ভূকৈলাসের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে। রামমোহনের নতুন ধর্মমতকে যাঁরা পছন্দ করতেন না, তাঁরাও অনেকে তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে তাঁর কাছে আসতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজা গোপীমোহন ঠাকুর, পাইকপাড়ার জয়কৃষ্ণ সিংহ, বিখ্যাত পণ্ডিত হরনাথ তর্কভূষণ ইত্যাদি।

এঁদেরই কয়েকজনকে নিয়ে রামমোহন প্রথমে তাঁর মানিকতলার বাড়িতে, পরে সিমলার নতুন বাড়িতে (আমহার্স্ট স্ট্রীটে) একটি সভা স্থাপন করেন, এই সভায় নানরকম আলোচনা হত, শাস্ত্রপাঠ হত, রামমোহনের—'একমেবাদ্বিতীয়ম' (এক ঈশ্বর ছাড়া দ্বিতীয় নেই) নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক চলত। এ সভায় জাতিভেদ ছিল না, সমাজভেদ ছিল না, সকলের জন্যেই ছিল অবারিত দ্বার। দেশের সমস্ত মানুষের জন্যেই জ্ঞান আর বুদ্ধির দরজা খুলে দিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু এই উদার ধর্মমত গোঁড়ারা বেশিদিন সহ্য করতে পারল না। ক্রমেই রামমোহনের বিরুদ্ধে নানারকম আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। রামমোহনও ছাড়ার পাত্র নন, সত্য আর যুক্তির ভিত্তিতে একসঙ্গে হিন্দু, মুসলমান আর ক্রিশ্চান গোঁড়াদের আক্রমণ করলেন তিনি।

হিন্দুরা রামমোহনের মুন্ডপাত কামনা করতে লাগলেন। মুসলমানরা ক্ষেপে উঠলেন তাঁর উপর । শ্রীরামাপুরের ক্রিশ্চান মিশনারিদের সঙ্গে কাগজে পত্রে রীতিমতো যুদ্ধ চলতে লাগল

তাঁর। সপ্তরথীঘেরা অভিমুন্যুর মতো বীরবিক্রমে সকলের সঙ্গে লড়াই শুরু করলেন রামমোহন।

বইয়ের পর বই লিখতে লাগলেন, প্রকাশ্য বিচার সভায় তাঁর কাছে বিধ্বস্ত হয়ে যেতে লাগলেন দিক্‌পাল পণ্ডিতেরা, তাঁর ফার্সি বই 'তুহফাৎ-উল্‌-মুহায়হিদিন', 'বেদান্তসার', 'বেদান্তগ্রন্থ', ইংরেজি 'ক্রিশ্চান-সমাজের প্রতি আবেদন'—চারদিকে যেন আগুন জ্বালিয়ে তুলল।

সারা ভারত চঞ্চল হয়ে উঠল—ইয়োরোপের ক্রিশ্চান সমাজে পর্যন্ত সাড়া পড়ে গেল। ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে রামমোহনের বই ছাপানো পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু রামমোহন হার মানতে জানতেন না, নিজের টাকায় তিনি নতুন প্রেস কিনলেন—সেই প্রেস থেকে চলতে লাগল তাঁর অপরাজেয় অভিযান।

দেশে তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব। কোম্পানি শিক্ষা প্রসারের কাজে কিছু কিছু অগ্রসর হচ্ছিলেন। রামমোহন অনুভব করলেন, ফার্সি আর সংস্কৃতের মধ্য দিয়ে এখন অতীতের তপস্যা করে লাভ নেই । তিনি চাইলেন ইংরেজির মাধ্যমে দেশে নতুন চিন্তা-চেতনার বন্যা এসে আছড়ে পড়ুক। ইংরেজি শিক্ষার সমর্থনে একবার লর্ড আমহার্স্টকে সুদীর্ঘ পত্র লিখলেন—যাতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। অনেক ঘাত—প্রতিঘাতের মধ্যে অবশেষে সৃষ্টি হল 'প্রেসিডেন্সি কলেজ'—রামমোহনের স্বপ্নতীর্থ—'বিদ্যালয় মহাপাঠাশালা'।

রামমোহন নিজেও একটি নতুন স্কুল গড়লেন। ইংরেজি শিক্ষা চাই—দেশে দেশে জ্ঞানের বিস্তার চাই—নতুন যুগের আলোয় জাতিকে জাগিয়ে তোলা চাই, নিজের হাতে তৈরি করলেন তাঁর 'অ্যাংলো-হিন্দু-স্কুল'। কিন্তু ছাত্র খুবই কম। নিজের ছেলে রমাপ্রসাদ, দ্বারকানাথ ঠাকুরের ছেলে দেবেন্দ্রনাথ, শিষ্য নন্দকুমার বসুর ছেলে রাজনারায়ন—আরও দু-চারজন। এদের কাছে রামমোহন শোনাতে লাগলেন নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা— হিন্দু-মুসলমান-ক্রিশ্চান-বৌদ্ধের মিলনের বাণী।

স্কটল্যান্ড থেকে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী 'আলেকজান্ডার ডাফ' কে নিয়ে আসলেন শিক্ষা বিস্তারের জন্য। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেই ডাফকে তিনি নিজেই বাড়ি যোগাড় করে দিলেন স্কুল খোলার জন্য। এখানেও একই সমস্যা। ছাত্র নেই। রামমোহন ছুটলেন—পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্র জুটিয়ে আনতে লাগলেন। এবারেও ব্যর্থ হলেন না তিনি। তাঁর বজ্রপতিজ্ঞা কখনোই ব্যর্থ হয়নি। ডাফ-এর সেই স্কুলই আমদের 'স্কটিশ চার্চ কলেজ'।

কাজ আর কাজ—কত কাজ। দেশে খবরের কাগজ নেই—অথচ জনমত প্রকাশের মুখপাত্র চাই। রামমোহন পত্রিকার পর পত্রিকা বের করে চললেন। 'সম্বাদ কৌমুদী', 'ব্রাহ্মণ সেবধি' ফার্সি 'মিরাৎ-উল-আখবার'—আরো কত কী! এইসব কাগজে তিনি প্রচার করতে লাগলেন তাঁর নতুন সর্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম, করে চললেন শাস্ত্রের বিচার, এনে দিতে লাগলেন নতুন চিন্তা আর আদর্শ। মেয়েদের ওপর সমাজের যে অত্যাচার চিরদিন চলে আসছে, তার প্রতিকার দাবি করলেন, ন্যায় বিচারের জন্য চাইলেন জুরির প্রথা, চাইলেন আসামির 'হেবিয়াস কর্পাসে'র অধিকার, প্রজার ওপর জমিদার পীড়নের অবসানের জন্য নতুন প্রজাস্বত্ব আইন। সেই সঙ্গে বেরুতে লাগল বইয়ের পর বই।

শত্রুর তো অভাব ছিল না। রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থীরাও তাঁদের বই পত্রে, পত্রিকায় কদর্য কটু ভাষায় গালাগাল করতে লাগলেন রামমোহনকে। রটে গেল তিনি ম্লেচ্ছ—তিনি গোরুর মাংস খান—আরো কত কী?

গালাগালির জবাব দিলেন না রামমোহন। ভদ্র সংযত ভাষায় তিনি নিজের যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করে চললেন। তাঁর সেই দুর্ভেদ্য বর্মে ঘা লেগে প্রতিপক্ষের অস্ত্র টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়তে লাগল।

যুক্তিতে যারা হারল, রাগে অন্ধ হয়ে উঠল তারা । রামমোহন রাস্তায় বেরুলে তাঁর গাড়িতে ঢিল পড়ে, বাড়ির চারদিকে লোক জড়ো হয়ে চিৎকার করে অকথ্য ভাষায়। তাঁর নামে গান বেঁধে নগর সংকীর্তন চলতে লাগল ঃ—

ব্যাটার সুরাই মেলের কুল,
ব্যাটার বাড়ি খানাকুল,
ব্যাটার জাত বোষ্টম কুল
ওঁ তৎসৎ বলে ব্যাটা বানিয়েছে ইস্কুল—

কিন্তু সত্যের পথ ধরে যিনি চলেছেন, এসব ক্ষুদ্রতা তাঁর গায়ে লাগে না। পায়ের নিচে কাঁটা ছড়ানো থাকলেও ছুটন্ত তেজি ঘোড়া কি থেমে দাঁড়ায়? সূর্যকে কয়েক টুকরো মেঘ কি করে আড়াল করে রাখবে?

কাজের কি শেষ আছে? দশ হাতে কাজ করে চলেছেন। তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি—প্রতিভাপ্রসন্ন ললাট—যেন জনগণমন অধিনায়ক হওয়ার ক্ষমতা নিয়েই জন্মেছেন। ব্রহ্মসভা, অ্যাংলো হিন্দু স্কুল, ডাফ স্কুল, ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে ভারতীয়দের অধিকার আদায় করবার আন্দোলন, দেশের শিল্পনৈতিক উন্নতি—যে দিকে তাকানো যায়, হিমালয়ের চূড়ার মতো রামমোহন ছড়িয়ে আছেন মাথা তুলে। দেশের সমস্ত প্রগতিশীল চিন্তাধারার মূর্ত বিগ্রহ রামমোহন। একটি মাত্র মানুষের মধ্যেই সারা ভারতবর্ষ সেদিন যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

এমন অসামান্য ব্যক্তিত্ব, এমন পাণ্ডিত্য আর এত বড়ো কর্মশক্তি নিয়ে তাঁর পরে আজ পর্যন্ত আর একজন মানুষও জন্মায়নি এশিয়ায়। একজনও না। সাত-আটটা-ভাষাই শিখেছিলেন। কাজ করে চলেছেন রামমোহন। শিল্প-বিস্তার, সমাজ-সংস্কার, শাসন-সংস্কার, ব্যক্তি স্বাধীনতার আন্দোলন, নারীর অধিকার। বইয়ের পর বই লিখে চলেছেন। বাংলায়, ইংরেজিতে, বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্মরণীয় দান তাঁকে এ যুগের

বাংলা গদ্যের অন্যতম স্রষ্টা হিসাবে ভাবতে সাহায্য করে। রামমোহনের---‘প্রবর্তক-নিবর্তক-সম্বাদ’-এর দু’টি প্রস্তাব মিলিয়ে পড়লেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে। রামমোহন পান্ডিত্য করতে চাননি---কিন্তু সহজ সুন্দর প্রাণের ভাষা লিখে তিনি বাংলা গদ্যের গোড়াপত্তন করে দিয়েছিলেন। পরে এই ভাষাই বিদ্যাসাগরের হাতে সম্পূর্ণভাবে প্রাণ পেয়ে উঠেছিল।

সহমরণ বিষয়ক ‘প্রবর্তক ও নিবর্তক সম্বাদ’ দুখন্ডে প্রকাশ করলেন। সতীদাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখিয়েই তিনি খান খান করে দিলেন সতীদাহ সমর্থনের অসাড় যুক্তিগুলিকে। কর্মযোগী রামমোহন নতুন উৎসাহে রণক্ষেত্রে নেমে পড়লেন—সতীদাহ নিরোধের সক্রিয় ভূমিকায় । দেশের বুক থেকে এতো বড়ো পাপ চিরদিনের মতো উপড়ে ফেলতে হবে তাঁকে। অবশেষে ১৮২৯ সালের ৪ঠা মতান্তরে ৭ই ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করলেন লর্ড বেন্টিঙ্ক।

ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজ্যপাট চলছে। কিন্তু দিল্লিতে তখনও নামমাত্র একজন বাদশা রয়েছেন, দ্বিতীয় আকবর। এই দ্বিতীয় আকবর তাঁর কতগুলো ন্যায্য অধিকার নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে আবেদন করেছিলেন। কোম্পানি সে আবেদন গ্রাহ্য করেনি। অগত্যা নিরুপায় হয়ে দ্বিতীয় আকবর ইংল্যান্ডের রাজার কাছে একজন ‘এলাচি’ বা দূত পাঠাবেন বলে স্থির করলেন।

স্বয়ং বাদশার দূত হতে পারে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এমন আর কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি ভারতবর্ষে আছেন রামমোহন ছাড়া? দিল্লির বাদশা তাঁকে ‘রাজা’ উপাধি দিয়ে ইংল্যান্ডে পাঠালেন। ১৮৩০ সালের নভেম্বর মাসে ‘অ্যালরিয়ন’ জাহাজে চড়ে রামমোহন ইউরোপের পথে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করলেন। সঙ্গে গেলেন রামরত্ন মুখোপাধ্যায়, পালিত পুত্র রাজারাম, দু’জন চাকর রামহরি দাস আর শেখ বক্‌সু। জাহাজ পথে ছ’মাস সময় লাগে ভারতবর্ষ থেকে বিলেত যেতে। পড়েন, লেখেন, ডেকে পায়চারি করেন—আর সঙ্গী যাত্রীদের সাথে ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি এই সব নিয়ে আলোচনা করেন রামমোহন। চলতে চলতে জাহাজ কেপটাউনে গিয়ে পৌঁছুল।

একটা দুর্ঘটনা ঘটল এখানে। জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে পড়ে একখানা পা ভেঙে গেল রামমোহনের। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ভাঙা পা তাঁর আর জোড়া লাগেনি।

কিন্তু পা ভাঙলে কি হয়—মনে তাঁর অদম্য শক্তি। এই কেপটাউনেই তিনি একদিন দু-খানি ফরাসি জাহাজ দেখতে পেলেন। বিপ্লবের ত্রিবর্ণ পতাকা উড়ছে তাদের ওপর। শরীরের অসহ্য যন্ত্রণা ভুলে গেলেন রামমোহন। সেই অবস্থাতেই তিনি মুক্তিযোদ্ধা ফরাসিদের অভিনন্দন জানাতে ছুটে গেলেন তাদের জাহাজে। মাথার ওপরে সেই উড়ন্ত স্বাধীনতার পতাকার দিকে তাকিয়ে উচ্ছল আনন্দে বলতে লাগলেন ঃ Glory, glory, glory to France—ফ্রান্স-ধন্য, ধন্য, ধন্য।

১৮৩১ সালেই ৮ই এপ্রিল রামমোহন লিভারপুলে পৌঁছুলেন। স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনা এগিয়ে এল চারদিক থেকে। লিভারপুল থেকে লণ্ডনে। পথে যেখানেই তিনি বিশ্রাম করেন, কৌতুহলী মানুষ ভিড় করে তাঁকে দেখতে।

লণ্ডনে পৌঁছে বাসা নিলেন রিজেন্ট স্ট্রীটে। সারা শহর তোলপাড়। ভারতবর্ষের এই অসামান্য মানুষটিকে দেখবার জন্যে সংখ্যাতীত লোক ছুটে আসতে লাগল। রাজনীতিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক কারা না ছিলেন তাঁদের মধ্যে। বেলা এগারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত তাঁর দরজায় গাড়ির ভিড় জমে থাকত। বন্ধ হয়ে যেত রাস্তা।

প্রথমে যখন রামমোহন লন্ডনে পৌঁছান, তখনই একটা স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল। সাময়িকভাবে রামমোহন বন্ডস্ট্রীটের একটা হোটেলে এসে উঠেছেন। মধ্যরাত্রিতে যখন হোটেলের সবাই ঘুমন্ত, তখন একজন বুড়োমানুষ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন রামমোহনকে দেখতে। এই লোকটি যে সে নন—দিকপাল দার্শনিক পন্ডিত জেরেমি বেনথাম স্বয়ং। বার্ধক্যের জন্যে বেনথাম কয়েক বছর যাবৎ কারো সঙ্গেই দেখা সাক্ষাৎ করতেন না। কিন্তু রামমোহনের সংবাদে তিনি নিজের বিশ্রাম ফেলে ছুটে এসেছেন।

ইয়োরোপের বড়ো বড়ো পন্ডিতেরা রামমোহনের প্রতিভাকে কতখানি সম্মান করতেন—এই ঘটনাই তার প্রমাণ।

রাজা চতুর্থ উইলিয়মের অভিষেক উৎসবে অন্যান্য দেশের রাজদূতদের সঙ্গে তাঁকে আসন দেওয়া হল। নতুন লন্ডন ব্রিজের উদ্বোধন উপলক্ষে রাজা উইলিয়ম যে ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন, সেখানেও রামমোহনকে পরম সমাদরে আহ্বান করা হয়েছিল।

তখনকার দিনে ইয়োরোপে কোনো কালা আদমির এত বড়ো সম্মান কল্পনারও অগোচর ছিল। কিন্তু এশিয়ার পুরুষসিংহ নিজের শক্তিতেই সেদিন তা আদায় করে নিতে পেরেছিলেন।

সতীদাহ বিলের কাজ তো ছিলই, আরো অনেক বড়ো কর্তব্য ছিল সামনে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তখন নতুন শাসনতন্ত্র রচনা করছিল, এই উপলক্ষ্যে হাউস অব্ কমনসে একটা সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়। সেখানে রামমোহনকে সাক্ষি দিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়, দেশের নানামুখী সমস্যা এবং তার সমাধান সম্পর্কে রামমোহন সেদিন সিলেক্ট কমিটির সামনে যে সব আলোচনা করেছিলেন, সেগুলিতে একদিকে তাঁর গভীর দেশাত্মবোধ, অন্যদিকে তাঁর প্রগাঢ় পান্ডিত্যের পরিচয় মেলে। নীচের বিষয়গুলো সম্পর্কে তাঁকে সাক্ষি দিতে হয়েছিল ঃ

১। ভারতবর্ষের রাজস্বপ্রথা ঃ এ সম্বন্ধে রামমোহনকে চুয়ান্নটি প্রশ্ন করা হয়। রামমোহন প্রজাস্বত্ব, খাজনার হার, কৃষক

এবং জনসাধারণের উন্নতি সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেন।

২। ভারতের বিচার পদ্ধতি ঃ এ বিষয়ে রামমোহনকে আটাত্তরটি প্রশ্ন করা হয়। রামমোহন বিস্তৃত উত্তর দেন।

৩। ভারতবর্ষে ইয়োরেপীয়দের বসবাস সম্পর্কে তাঁর অভিমত গ্রহণ করা হয়।

৪। ভারতবর্ষের প্রজাদের অবস্থা ঃ এ বিষয়ে রামমোহন বিস্তৃতভাবে সাক্ষ্য দেন।

রামমোহনকে যে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছিল তার দু একটি নমুনা দেওয়া হল। প্রশ্ন ঃ বর্তমানে বাংলাদেশে জমিদারি প্রথা এবং মাদ্রাজের রায়ৎ-ওয়ারি-প্রথার ফলে প্রজাদের কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে?

উত্তর ঃ 'এই দু'টি প্রথার ফলেই গরিব প্রজাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছে। একদিকে জমিদারের স্বার্থপরতা আর লোভ তাদের সর্বনাশ করছে, অন্যদিকে রাজস্ববিভাগের সরকারি আমিন আমলাদের চাপে তাদের প্রানান্তকর অবস্থা। আমি এজন্য অত্যন্ত মর্মপীড়া বোধ করি। বাংলাদেশের জমিদারেরা খাজনার হার বাড়ানোর ব্যাপারে সরকারের কাছ থেকে যা খুশি প্রশ্রয় পায়, আর গরিব চাষীরা সবরকম সুযোগ থেকেই বঞ্চিত। কোনো বছর যদি বাড়তি ফসল হয় আর ফসলের দাম কমে যায়, তাহলে চাষীদের প্রায় সব ফসল বেচে দিয়ে জমিদারের খাজনা মেটাতে হয়, তাদের ঘরে না থাকে এতটুকু খাবার, না থাকে একমুঠো বীজধান।'

নিজে জমিদার হয়েও জমিদারি প্রথার কুফল সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় সত্যকে তুলে ধরেছিলেন তিনি।

আর একটি প্রশ্ন ঃ 'আপনি ভারতের বিচার প্রথায় কতগুলি দোষত্রুটি দেখিয়েছেন। কিভাবে তাদের সংশোধন করা যায় বলে আপনি মনে করেন?'

উত্তর ঃ ভারতবাসীর রীতিনীতি, চালচলন, ভাষা, সমাজ ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে ইয়োরোপীয় বিচারপতিরা কিছুই জানেন না। সুতরাং তাঁদের পক্ষে সুবিচার করা কখনোই সম্ভব নয়। অপরপক্ষে যাঁরা ভারতবাসী তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে সরকারের কাছ থেকে পেয়েছেন পরাধীনতা আর উপেক্ষা, তাই দেশীয় বিচারকদেরও সাধারণের কাছে কোনো মর্যাদা নেই। সুতরাং আমার মতে, ভারতীয়দের অভিজ্ঞতার সঙ্গে ইয়োরপীয়দের ন্যায়পরায়ণতা মিলিত হলেই দেশে সুবিচার সম্ভব হতে পারে।

সে যুগের পক্ষে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জন্যে যতখানি করা সম্ভব রামমোহন তা প্রাণপণ করতে চেয়েছিলেন। অথচ আমাদের পরম দুভার্গ্যে যে আজও রামমোহনকে আমরা ভালো করে চিনতে শিখিনি, তাঁর উপযুক্ত মর্যাদাও দিতে পারিনি। অথচ একজন পেরেছিলেন। তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। একবার রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাঁর জীবনে আদর্শ মানুষ কে? কবিগুরু অসঙ্কোচে জবাব দিয়েছিলেন ঃ রামমোহন রায়। যথার্থ উত্তরই বটে!

দেশটির নাম ফ্রান্স। ফ্রান্সে তাঁকে যেতেই হবে। রুসো - ভলতিয়ার ---দিদরোর জন্মভূমি। এই দেশের লেখকরাই (এন্‌সাইক্লোপিডিস্ট) সারা পৃথিবীতে স্বাধীন চিন্তার আর বৈপ্লবিক মনোভাবের জোয়ার এনেছেন। এই ফ্রান্সেই ঘোষিত হয়েছে ঃ সাম্য স্বাধীনতা আর ভ্রাতৃত্বের বাণী, এখানেই ভেঙেছে বাস্তিলের কারাগার, এখানেই ফরাসি বিপ্লবের রক্তমশাল জ্বলেছে আগামী ইতিহাসের সূর্যোদয়ের মতো, ফ্রান্সে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে তিনি প্যারির বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে একখানা দরখাস্ত করেন। এই দরখাস্তখানা নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিকদের মতে এতে দেশ ও জাতি-নির্বিশেষে সমগ্র মানুষের একতার বাণী শুনিয়েছেন রামমোহন। এমনকি তখনকার দিনেও আজকের মতো একটি লিগ্ অব্ নেশনস্ বা জাতিসংঘ গঠন করে পৃথিবীতে শান্তি ও মিত্রতা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এই দরখাস্তে পরিলক্ষিত হয়। রামমোহন জানতেন নানা দেশের মানুষের মধ্যে সহজ মেলামেশা আর ভাবের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়েই সত্যিকারের আন্তর্জাতিক প্রীতি ও মৈত্রী গড়ে উঠতে পারে। পরবর্তীকালে 'জাতিসংঘ' গঠন করে শান্তিপূর্ণভাবে বিশ্ব সমস্যা সমাধানের পূর্বাভাস রামমোহন এইভাবে সেদিন দিয়েছিলেন। ইয়োরোপের কাছে শান্তি ও মৈত্রীর বার্তা বয়ে নিয়ে যাওয়া রামমোহনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

অতিরিক্ত পরিশ্রম আর মাথার খাটুনিতে রামমোহনের জীবনীশক্তি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। সারা জীবনের অক্লান্ত সৈনিক এবার বুঝি দেহে মনে বিশ্রামের ডাক শুনতে পেলেন।

১৮৩৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর জ্বরে পড়লেন রামমোহন। দিনের পর দিন অবস্থা খারাপের দিকে যেতে লাগল। নানাবিধ সেবা-শুশ্রুষা করেও কিছু সুরাহা করা গেলনা। অবশেষে ২৭শে সেপ্টেম্বর স্টেপল্টন গ্রোভেই ভারতপুরুষ রামমোহনের ক্লান্ত চোখে শেষ ঘুম ঘনিয়ে এল।

শোকশান্ত একটা বিষন্নদিনে -স্টেপল্টন গ্রোভের ছায়াবীথির তলায় রামমোহনের শেষকৃত্য সমাধা হয়ে গেল।

প্রায় দু'শো বছর হতে চলল। রামমোহন আমাদের কাছ থেকে চলে গেছেন।

কিন্তু যে প্রতিভাদীপ্ত, উন্নত, ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, সে স্বপ্ন কি আমরা সফল করতে পেরেছি? রামমোহন ছিলেন 'Prophet of New India'— নব ভারতের অগ্রদূত। তাঁর সেই নতুন ভারতবর্ষ কি গড়ে তুলতে পেরেছি আমরা?

এই প্রশ্নের উত্তরের ওপরেই নির্ভর করে আমাদের অধিকার, রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসী বলে পরিচয় দেবার অধিকার।

[লেনিনের জন্মের সার্ধশত বর্ষ উপলক্ষ্যে সন্নিবেশিত করা হল নিবন্ধখানি—সম্পাদকমণ্ডলী]

সার্ধশতজন্মবর্ষে লেনিন : কয়েকটি কথা

অপূর্বমোহন মুখোপাধ্যায়

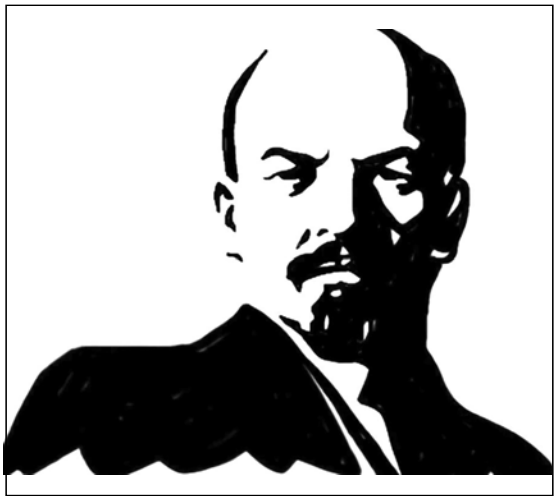

২০২০ সালটি নানা ঐতিহাসিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। আজ থেকে ২০০ বছর আগে বাংলায় জন্মেছিলেন নবজাগরণের দুই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত। আজও যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি চিন্তায় এই দুই ব্যক্তি আমাদের পথিকৃৎ। সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁদের প্রণাম জানাই।

আজ থেকে ২০০ বছর আগে পৃথিবীতে এসেছিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের অন্যতম এক স্রষ্টা। শ্রমজীবী মানুষ তথা শোষিত মানুষের মুক্তির আলোকবর্তিকার এক অন্যতম স্থপতি রূপে তিনি আমাদের কাছে পরিচিত। সেই ব্যক্তি হলেন ফ্রেডরিক এঙ্গেলস। পৃথিবীর শোষিত মানুষ আজও তাঁকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করে।

আজ থেকে দেড়শো বছর আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের শোষিত মানুষের মুক্তির স্বপ্নকে প্রথম বাস্তবায়িত করেন। সেই ব্যক্তি আর কেউ নন, সারা বিশ্বে তিনি পরিচিত লেনিন রূপে। ১৮৭০ সালে ২২ এপ্রিল ভোলগা নদীর তীরে রাশিয়ার সিমব্রিস্ক শহরে ইলিয়া উলিয়ানভ ও মারিয়া আলেকসান্দ্রোভানার সন্তান ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ জন্মগ্রহণ করেন। মহান অক্টোবর বিপ্লবের রূপকার ছিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ। কিন্তু সারা বিশ্বের কাছে আজও এই মানুষটি লেনিন রূপে খ্যাত।

আলোচ্য নিবন্ধে লেনিনের সার্ধশতজন্মবর্ষে তাঁর চিন্তা যা আজও প্রাসঙ্গিক সেই সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থাপিত করা নিবন্ধকারের উদ্দেশ্য। নিবন্ধের প্রথম অংশে লেনিনের জীবন ও রচনা সম্পর্কে কয়েকটি কথা এবং দ্বিতীয় অংশে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্ব ও একবিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা আলোচনা করার চেষ্টা করা নিবন্ধকারের লক্ষ্য।

লেনিনের জীবন ও রচনা :

লেনিনের বাবা ছিলেন শিক্ষক ও মা ছিলেন সংগীতজ্ঞ। লেনিনরা ছিলেন ছয় ভাই বোন। তাঁর দাদা আলেকসান্দার ছিলেন তাঁর প্রেরণা। ১৮৮৬ সালে লেনিনের বাবার মৃত্যু হয়। ১৮৮৭ সালে জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারকে খুনের অভিযোগে তাঁর দাদার প্রাণদণ্ড হয়। এই ঘটনা লেনিনের জীবনের এক অন্যতম বড়ো ঘটনা যা তাঁর জীবনকে প্রভাবিত করে। প্রসঙ্গক্রমে এটা উল্লেখ্য যে, লেনিনের দাদার সাথেও তৎকালীন নারদনিক গোষ্ঠীর যোগাযোগ ছিল। লেনিনের জীবনের এই প্রতিকূল অবস্থায়ও তিনি পড়াশুনা ছাড়েন নি। তিনি বিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ করে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষাপর্ব শেষ করতে পারেন নি। ছাত্রদের প্রতিবাদী আন্দোলনের কারণে যুক্ত থাকার জন্য তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হলে তিনি পরবর্তী সময়ে ১৮৯১ সালে বহিরাগত ছাত্র হিসাবে সেন্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্নাতক হন। ১৮৯৩ সালে তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গে চলে আসেন। তিনি যখন কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন সেই সময় তাঁর মার্কস এঙ্গেলসের লেখার সাথে পরিচয় ঘটে। পড়াশুনোর পাশাপাশি তিনি মার্কসবাদে দীক্ষিত হন এবং মার্কসবাদী চক্রে যুক্ত হন। তিনি নারদনিকদের সমালোচনা করে প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখতে শুরু করলেন। ১৮৯৩ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত লেনিনের যে সকল লেখা আমরা দেখি সেইসব লেখাগুলো রাশিয়ান বিপ্লবী চিন্তা

ও কর্মধারার সাথে যুক্ত ছিল। ১৮৯৪ সালে লেনিন লিখলেন What the "Friends of the People" are and How they fight the Social-Democrats. ১৮৯৫ সালে তিনি লিখলেন The Economic content of Narodism and the criticism of it in Mr. Struve's Book. তিনি কেবলমাত্র লেখালেখির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি। তিনি সংগঠন গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, লেনিন যখন কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনোয় যুক্ত ছিলেন তখন তিনি মার্কসবাদের প্রচারের জন্য ১৮৮৩ সালে প্লেখানভের নেতৃত্বে জেনিভায় রাশিয়ার প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন Emancipation of Labour Group গড়ে উঠলে তাতে যুক্ত হন। ১৮৯৮ সালে লেনিনের নেতৃত্বে সেন্ট পিটার্সবুর্গে গড়ে ওঠে League for the Emancipation of the working class। রাজনৈতিক কার্যকলাপের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাইবেরিয়াতে তাঁকে নির্বাসিত করা হয়। ইতিমধ্যে ১৮৯৮ সালে লেনিনের নেতৃত্বে গঠিত হয় রাশিয়ান সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি। রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণির প্রথম রাজনৈতিক দল।

লেনিন যখন সাইবেরিয়াতে ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে নাদেজদা ক্রুপস্কায়ার সাথে পরিচয় ঘটে ও তাঁরা প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

লেনিনের নির্বাসন থেকে ফিরে আসার পর রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলন এক নতুন মাত্রা পেল। আর.এস.ডি.এল.পি.-র মুখপত্র ইসক্রা যার অর্থ স্ফুলিঙ্গ তা প্রকাশিত হল ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে। লেনিন মনে করতেন যে, সংগঠনের মুখপত্র রাজনৈতিক প্রচারকও বটে। সংগঠনের মুখপত্রে নানা রচনা লেখার সাথে এই কালপর্বে সংগঠন আন্দোলনের পরিস্থিতি সংক্রান্ত নানা গ্রন্থ লিখতে শুরু করলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থসমূহ যথা :— ১৯০২ সালে What is to be done (কি করিতে হইবে), ১৯০৪ সালে One step forward, two step backward (এক পা এগিয়ে, দু পা পিছিয়ে), ১৯০৫ সালে Two Tactics of Social Democracy (সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসীর দুই কৌশল) প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে ১৯০৩ সালে আর.এল.ডি.পি.র দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই পার্টি কংগ্রেস ব্রাসেলস ও লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সংগঠনকে কেন্দ্র করে বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে মত পার্থক্য দেখা দেয়। সংগঠন দুটো ভাগে বিভক্ত হয়। একটি বলশেভিক ও অন্যটি মেনশেভিক। লেনিন ও তাঁর সহযোগীরা বলশেভিক রূপে পরিচিত হন। প্রসঙ্গতঃ এটা উল্লেখ্য যে, লেনিন ১৯০০ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত বেশিরভাগ দেশের মধ্যে থাকতে পারেন নি। কিন্তু দেশের বাইরে থাকলেও তিনি কিন্তু রাশিয়ার আন্দোলনের দিকনির্দেশ করেন ও অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯০৫ সালে জানুয়ারি মাসে রাশিয়ার বিপ্লবের সূচনা হলেও তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। রাশিয়ার মধ্যেকার আন্দোলন সম্পর্কে, রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে লেনিন প্রতিনিয়ত খোঁজ রাখতেন। ১৯১২ সালে প্রকাশিত হল বলশেভিক পার্টির মুখপত্র প্রাভদা।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া যখন যুক্ত হয়ে পড়ে তখন এক ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয় ওই দেশে। ওই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লেনিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিরত করার আওয়াজ তোলেন যার পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত হয় মহান অক্টোবর বিপ্লব পরিবর্তিত ক্যালেণ্ডার অনুসারে যা নভেম্বর বিপ্লব নামে সমধিক পরিচিত। ৭ই নভেম্বর থেকে ১৭ই নভেম্বর এই দশদিনের সংগ্রামের কাহিনি আমরা জানতে পারি ব্রিটিশ সাংবাদিক জন রীডের কালজয়ী লেখা 'দুনিয়া কাঁপানো দশদিন' গ্রন্থের মাধ্যমে। লেনিনের নেতৃত্বে নভেম্বর বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠল এক নতুন ব্যবস্থা যা সমাজতন্ত্র নামে পরিচিত। শোষণহীন বৈষম্যহীন এক ব্যবস্থা কায়েম হল রুশ দেশে। বলশেভিক দল রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলে লেনিন কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারস এর সভাপতি হন। ১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারি রুশ বিপ্লবের নায়ক মহামতি লেনিনের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। লেনিন ছিলেন সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম রূপকার। তিনি একাধারে মার্কসবাদী তত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়েছেন আবার সেই তত্ত্বকে তাত্ত্বিকস্তরে সীমাবদ্ধ না রেখে তার সফল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তিনি মার্কস-এঙ্গেলস প্রবর্তিত মার্কসবাদের তাত্ত্বিক বিকাশ ঘটান। দল, রাষ্ট্র, বিপ্লব, সর্বহারার শ্রেণির একনায়কত্ব, সাম্রাজ্যবাদ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর মৌলিক অবদান পরিলক্ষিত হয়। তাঁর চিন্তাকে বলে লেনিনবাদ। স্তালিনের ভাষায়, "লেনিনবাদ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ যুগের মার্কসবাদ"। লেনিন মার্কসবাদের সৃষ্টিশীল বিকাশ ঘটিয়ে মার্কসবাদকে সমৃদ্ধ করেন। তাই মার্কসবাদ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ রূপেও পরিচিত। কয়েকটি গ্রন্থের নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ওইগুলি ব্যতিরেকে তাঁর লেখা অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করছি যা মার্কসবাদে অনন্য সংযোজন। সেগুলি হল :— (১) The Development of Capitalism in Russia (1899), (২) Materialism and Empirio-Criticism (1908), (৩) Imperialism : The Highest Stage of capitalism (1916), (৪) The State and Revolution (1917) প্রভৃতি।

দ্বিতীয় অংশ :

এই অংশে লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত তত্ত্ব ও আজকের সময়ে সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা এই বিষয়ে আলোচনার চেষ্টা করব। প্রথমেই বলে রাখি যে, এই আলোচনার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা করতে হবে। ফলে অনেক কিছু ব্যাখ্যা বা বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছে থাকলেও করা সম্ভব নয়। তাই আলোচক সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত লেনিনের ধারণাকে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করবে। প্রথমেই বলা দরকার সাম্রাজ্যবাদ বলতে কি বোঝায়? সাম্রাজ্যবাদের নানা সংজ্ঞা আছে। তার মধ্যে না গিয়ে সাধারণভাবে বলা যায় যে, একটি দেশ যখন অন্য একটি দেশের ভূখণ্ড দখল করে সরাসরি সেই দখলীকৃত দেশের উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব কায়েম করে তখন তাকে সাম্রাজ্যবাদী দেশ রূপে গণ্য করা যায়।

মার্কস এঙ্গেলস তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক সংকট, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পতনের বিষয়গুলিকে উপস্থাপিত করেছিলেন ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছিলেন। বিংশশতাব্দীতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যে গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয় মার্কসীয় বোঝাপড়ার মাধ্যমে লেনিন সেই পরিবর্তনের ব্যাখ্যা প্রদান করেন ও সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত তাঁর তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত লেনিনের তত্ত্ব মার্কসবাদে লেনিনের এক মৌলিক অবদান। ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয় লেনিনের গ্রন্থ Imperialism : The Highest Stage of Capitalism (সাম্রাজ্যবাদ : পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়)। এই গ্রন্থে লেনিন মার্কসীয় বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদের বিশ্লেষণ করেন। এটি একটি ছোটো গ্রন্থ। কিন্তু লেনিন এই গ্রন্থটি লিখতে গিয়ে প্রচুর গবেষণা করেন। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৪৮ টি বই ও ৪৯ টি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি তিনি পড়াশুনো করে তাঁর তত্ত্বকে বিকশিত করেন।

লেনিন ব্যতিরেকে মার্কসবাদী চিন্তার প্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত আলোচনা যাদের লেখনীর মাধ্যমে আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়, তাঁদের নাম ও গ্রন্থ উল্লেখ করা হল :

(১) অস্ট্রিয়ার চিন্তাবিদ রুডলফ হিল ফারডিং Finance Capital (1901) গ্রন্থে।

(২) পোল্যান্ডের মার্কসবাদী বিপ্লবী রোজা লুকসেমবুর্গ The Accumullation of capital (1913) গ্রন্থে এবং (৩) রাশিয়ার নিকোলাই বুখারিন তাঁর Imperialism and world Economy (1915) গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এছাড়া উদারনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন বৃটিশ সাংবাদিক জন হবসন তাঁর Imperialism : A study (1902) এই গ্রন্থে।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত লেনিনের তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। তাই এই নিবন্ধে লেনিন কর্তৃক বর্ণিত সাম্রাজ্যবাদের অর্থ সংক্ষেপে আলোচনা করব। তিনি সাম্রাজ্যবাদের পাঁচটি লক্ষণের কথা বলেছেন।

(১) উৎপাদন ও পুঁজির কেন্দ্রীকরণ বিকশিত হয়ে এরূপ অবস্থায় পৌঁছেছে যে, একচেটিয়া কারবার সৃষ্টি করেছে।

(২) শিল্পপুঁজির সাথে ব্যাঙ্ক পুঁজির মিলনের ফলে মহাজনী পুঁজি (Finance Capital)-এর সৃষ্টি হয়। তাকে ভিত্তি করে Financial Oligarchy প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৩) পণ্য রপ্তানি থেকে আলাদা যে পুঁজি রপ্তানি তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

(৪) বাজার বন্টন, উৎপাদনের পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে গোটা দুনিয়াটাকে এরা নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে।

(৫) সবচেয়ে বড়ো বড়ো পুজিবাদী দেশগুলোর মধ্যে সারা দুনিয়ার অঞ্চলগুলির ভাগ বাঁটোয়ারা সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

লেনিন সাম্রাজ্যবাদের এই লক্ষণগুলি বিবৃত করে বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিবাদের একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্যায়। সাম্রাজ্যবাদের তিনটি চরিত্রের উল্লেখ করেন লেনিন। তিনি বলেন, সাম্রাজ্যবাদ হল (১) একচেটিয়া পুঁজিবাদ (২) পরগাছা পুঁজিবাদ (৩) মুমূর্ষু পুঁজিবাদ। এইগুলির বিস্তৃত বিশ্লেষণ এখানে সম্ভব নয়। তাই এই বিশ্লেষণ থেকে নিজেকে নিবৃত্ত থাকতে হচ্ছে।

তবে এখানে এটা বলা দরকার যে, সাম্রাজ্যবাদ আজও রয়েছে যদিও আজ প্রত্যক্ষভাবে কোনো দেশ দখল করা সম্ভব নয়। তাই সাম্রাজ্যবাদ তার কৌশল পরিবর্তন করেছে। আমরা নতুন শব্দের সাথে পরিচিত হচ্ছি। সেটা হচ্ছে নয়া উপনিবেশবাদ। নয়া উপনিবেশবাদে আমরা দেখতে পাই যে, অর্থনৈতিক সাহায্য, সামরিক সাহায্য ইত্যাদির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী দেশ তার কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়।

বিংশশতাব্দীর নব্বইয়ের দশক থেকে আন্তর্জাতিক দুনিয়ার মানচিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটে আর অন্যদিকে বিশ্বায়নের নামে

বর্তমানে লগ্নীপুঁজির দাপট পরিলক্ষিত হয়। অনেকে মনে করেন যে, বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ বলে কিছু নেই। কিন্তু তা নয়। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বিস্তৃত করে আলোচনা শেষ করব।

এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, লেনিন যখন সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন তার থেকে আজকের পরিস্থিতির গুণগত বদল ঘটেছে। সেই সময় লগ্নীপুঁজি ছিল জাতিরাষ্ট্র ভিত্তিক পুঁজি। কিন্তু আজকের লগ্নিপুঁজি বিশ্বায়িত পুঁজি। লগ্নিপুঁজির আধিপত্য সমগ্র বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আরেকটি বিষয় হল দুটি বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে যে দ্বন্দ্বের তীব্রতা পরিলক্ষিত হয় বর্তমানে তা ততটা তীব্র নয় কিন্তু তাদের মধ্যে বিরোধের অবসান হয়েছে এটা ভাবাটাও ভুল হবে। বর্তমান সময়ে লগ্নিপুঁজির আধিপত্যের স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের শক্তিকে সংহত করার লক্ষ্যে নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ অর্থনীতি, রাজনীতি ও মতাদর্শ এই তিনটি ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি। বর্তমানে তথ্য ও প্রযুক্তির যে উন্নতি হয়েছে তার প্রেক্ষিতে তথ্য সাম্রাজ্যবাদ-এর উদ্ভব আমরা প্রত্যক্ষ করি। বর্তমানে আমরা বৃহৎ মিডিয়ার ওপরে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যক্ষ করি। মিডিয়া এখন একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থকে রক্ষা করে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ফলে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে, জলবায়ুর পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশ গণতন্ত্রের নামে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যত হয়েছে। এইরকম অসংখ্য ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে যার মাধ্যমে এটা সহজেই বোঝা যায় যে, সাম্রাজ্যবাদ আজও প্রাসঙ্গিক। নতুন আঙ্গিকে বিশ্বে তার উপস্থিতি সে জানান দেয়। সমস্ত বিশ্বে আজ দক্ষিণপন্থী মতাদর্শ মাথাচাড়া দিচ্ছে। দক্ষিণপন্থী মতাদর্শের বিরুদ্ধে লড়াই আর সাম্রাজ্যবাদের নতুন আঙ্গিককে উপলব্ধি করে তার বিরুদ্ধে লড়াই এই দুটো আজকের পরিস্থিতিতে অত্যন্ত জরুরী। আর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই সফল হতে পারে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে সংহত করার মধ্য দিয়ে। শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে ব্যাপক মানুষের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলে সাম্রাজ্যবাদ পরাজিত হবে। নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

ঋণস্বীকার :

এই লেখাটা লেখার জন্য আমি নানারকম গ্রন্থ ও পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি। আমি সকল গ্রন্থের লেখকের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

তথ্যসূত্র :

১. কমরেড লেনিন : অমল দাশগুপ্ত
২. রুশ বিপ্লবের কাহিনি : সুদর্শন রায়চৌধুরী
৩. মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা : শোভনলাল দত্তগুপ্ত
৪. এন.বি.এ. কর্তৃক প্রকাশিত ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন
৫. রাষ্ট্রবিজ্ঞান অভিধান : অশোককুমার সরকার
৬. মার্কসবাদী পত্রিকাসমূহ
৭. লেনিন রচনাসংগ্রহ

গল্পধারা

বাঁচন-লড়াই

এ কে এম শামসুল হুদা

বড় নাজুক অবস্থার মধ্যে দিন চলছে মানসারা বিবির। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। রেজা - মানে রেজা উল—তার স্বামী একজন পরিযায়ী শ্রমিক। কাজ করে হরিয়ানায়। আগে অবশ্য এখানেই জন মজুরের কাজ করত। কিন্তু বেশ কয়েক বছর হল কাজে মন্দা আসায় গনি ভাইয়ের সাথে চলে যায় হরিয়ানায়। চলে যাচ্ছিল দিনগুলো। একটা ছেলে, একটা মেয়ে। ছেলেটা অর্থাৎ রোহন বড়ো—পড়ে ক্লাস ফোরে। মেয়েটার নাম রেহেনা—দেখতে বড়ো মিষ্টি বলে নাকি রেজা ওকে আদর করে ডাকে মুন্নি বলে। তাই শুনে সকলেও বলে মুন্নি। সেই থেকে মানসারা কে সবাই ডাকে 'মুন্নির মা'। যাইহোক এই মুন্নির মাকে বড়ো কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। কী করে যে সে সংসার সামলাচ্ছে তা সে নিজেও বুঝে উঠতে পারছে না। রেজা যে পয়সাকড়ি পাঠাত, তা নিয়ে পঞ্চাশোর্ধ শাশুড়ি আর দুই সন্তানকে নিয়ে সংসার চালাতে হ'ত। সন্তানদের পড়াশুনা চালাতে গেলে এই টাকায় চলবে না বুঝতে পেরে সে গ্রামেরই বেশ শিক্ষিত স্বচ্ছল এক মল্লিক পরিবারে পরিচারিকার কাজে লেগে যায়। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে সন্ধ্যার পর রোহনকে পড়াতে বসায়। মানসারা যখন সাত ক্লাসে পড়ে, সেই সময়ে হঠাৎ করে মরে যায় তার বাপ। পড়া তার বন্ধ হয়ে যায়—মা চোখে অন্ধকার দেখে। নেহাত সামান্য হাতের কাজ জানা থাকায়—তার সাহায্যে সংসার চালিয়ে কয়েক বছর পর মানসারাকে পাত্রস্থ করে বিয়ে পাশ রেজার সঙ্গে। রেজা বেশ ভালো ছেলে। পাশের পাড়ার ছেলে। মানসারার মা-র বিশ্বাস ছিল, হোক না রেজারা গরিব— কিন্তু শিক্ষিত ছেলে—নিশ্চয়ই একদিন চাকরি পাবে। তাই সে রেজাকে জামাই করে। রেজারও বাপ নেই। চাকরি পায় নি তো কী! তাই বলে সে হা-পিত্যেশ করার ছেলে নয়। গতর খাটিয়ে বা রোজগার করে তাতেই মা আর বৌ-কে নিয়ে চলে যায় তার সংসার। রেজা-মানসারা খুশি, সুখী। আর তাদের সুখের ফসল হ'ল রোহন আর মুন্নি। মুন্নির তখন জন্ম হয়নি, রোহন খুবই ছোটো। রাজ্যে পালা বদলের জোর দাপট চলছে। রেজাও তার এলাকায় অন্যান্যদের নিয়ে নতুন দলকে জেতাতে কোমর বেঁধে লেগেছিল। ভোটে জিতল তার দল। ওহ, কী আনন্দ। আনন্দের প্লাবনে খড়-কুটোর মতো উড়ে যায় বিরোধীরা। বিরোধীদের অফিসগুলো ছিন্নভিন্ন হ'ল, তাদের অনেকের ঘরদোর ভেঙে তছনছ করা হ'ল—কোনো কোনো স্থানে বিরোধীদের খুন-খারাবি পর্যন্ত হতে হ'ল। রেজা-মানসারার চোখের সামনে এসব হয়। এরা বোধ হয় একটু নরম ধাতুতে গড়া বলে এসব দেখে-শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিল। যাইহোক, নতুন সরকার ঘোষণা করেছিল রাজ্যের ক্লাবগুলোকে লক্ষ টাকা দেওয়া হবে—কেননা এটা উন্নয়নের অঙ্গ। তড়িঘড়ি করে রেজা-মহিমরা একটা নতুন ক্লাব গড়ে ফেলে। যদিও অনেক আগে থেকে একটা ক্লাব গ্রামে আছে। কিন্তু তার বেশির ভাগ সদস্য বিরোধী। পুরনো ক্লাব বাদে নতুন ক্লাবে টাকা এল। মোচ্ছব করে করে টাকা উড়ে গেল। এসবে অবশ্য রেজার কোনো মত ছিল না—আবার তার কোনো মত কেউ গ্রাহ্যই করল না। ক্লাবের মধ্যে রেজা যেন একঘরে হয়ে যায়।

কিছুদিন পর থানা থেকে খবর আসে—তোমাদের এলাকা থেকে জনাচারেক সিভিক পুলিশ নেওয়া হবে—নাম পাঠাও। কর্মীদের মিটিং বসে। সরীফ, মনোয়ার, হান্নান আর কেরামতের নাম পেশ করে মহিম। বেশির ভাগ সদস্য হাত তুলে সমর্থন করে। লুৎফর অনুযোগ করে ''মহিমদা,রেজাভাই বিয়ে থা করেছে—তার একটা বাচ্ছাও আছে, মা-ও আছে—ওর নামটা দিলে না?'' ''আরে রেজা ভাই শিক্ষিত মানুষ—ওনার কি এসব মানায়? লেখাপড়া জানা মানুষ---ওনার চাকরি সাজে?'' কয়েকজন রেজার সমর্থনে মাথা নাড়লেও সাহস করে কিছু বলতে পারেনি—লুৎফর ছাড়া। দিনমজুরি করে গতর পেষাই করে দিন চালায় রেজা। গ্রামের রাস্তা ঢালাই হচ্ছে—দেখাশোনা করছে সুবিদ আর করম। ভার দিয়েছে মহিম। দুঃখ পায় রেজা। মহিম তো তার পাড়ার ছেলে? ভোটের সময় রেজার নেতৃত্বে

সকলে চলত। আর এখন সব উলটো! সান্ত্বনা দেয় মানসারা—‘দেখ, তুমি তো ওদের মতো নও, যে ‘ধর’ বললে ‘বেঁধে’ আনবে। সারা রাজ্যের কথা শুনছো না কারা সব দাপিয়ে বেড়াচ্ছে? এখন মস্তানদের রমরমা। তাছাড়া মহিমভাই তো বলেছে তোমার এসব কাজ মানায় না, দেখো, ভাল কাজ তোমার নিশ্চয়ই হবে।” তবুও রেজার মন এতে সায় দেয় না। বলে—“মহিমের হাব-ভাব আমার ভালো ঠেকছে না।” হতাশ সুর রেজার।

বড়ো আশায় ছাই পড়ছে রেজার। যে-রকম দিনমজুরি করত, সেরকমই চালাতে হচ্ছে। কখনও মাঠে তো কখনো পানবরোজে আবার কখনও বা রাজমিস্ত্রির যোগাড়ে হিসাবে। আগেও এরকম করে চলত, কিন্তু তখন মনে শান্তি ছিল, তফাৎ এখন এসে জুটেছে মানসিক অশান্তি। তার শুধু মনে হয় তার প্রাপ্য থেকে সে বঞ্চিত হচ্ছে। মানসারা সব বুঝতে পারছে—তবুও সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে, যদিও সেও মনে মনে ভেঙে পড়ছে। তার চোখের সামনে দিয়ে কেমন মহিমের বৌ আই সি ডি এস-এর মাস্টার হয়ে গেল,তার জা হ’ল রাঁধুনি। হারুনের বৌ, নসীমের বোন, মতির ভাবী—এরাও আই সি ডি এস-এ চাকরি পেল! মানসারা যে ভোটের সময় বাড়ি বাড়ি গিয়ে এত খাটল—তার কোনও দাম নেই! অবশ্য, কানে কানে কথা হেঁটে এসে তার কানেও পৌঁছেচে যে এতে মহিমের টু-পাইস জুটেছে।

এরই মধ্যে তাদের কোলে এল ফুটফুটে মুন্নি। খুশির মাঝেও দুশ্চিন্তা জোটে। সংসার চালানোর। বর্ষার পানি সারা বছর মাঠ থেকে আর নামতে চায় না। যাদের জমি আছে, কষ্ট-ক্লেশ করে যদিও বা বোরো ধান চাষ করে, দেখা গেল, আসল দরকারের সময় খালে পানি নেই—গাছ শুকিয়ে কাঠ। অথচ আগে প্রতি বছর সরকার থেকে মাইকে বলে যেত কতদিন পর্যন্ত পানি দেওয়া হবে। সার-বিষের দাম আগুণ, আবার পানির আকাল — তাই বাধ্য হয়ে বেশির ভাগ চাষি চাষ ছেড়ে দেয়। বন্যায় বরোজ ডুবে যাওয়ায় পান চাষও প্রায় উঠে যায়। যে-গতরের ওপর ভরসা করে তার সংসার চলে, সেই গতর খাটানোর সুযোগও চলে যেতে বসেছে।

একদিন মহিম এসে বললে—“রেজা ভাই, প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষক নেওয়া হবে—পরীক্ষা নেওয়া হবে নাম মাত্র। আমাদের এম এল এ-কে টাকা দিলে চাকরি বাঁধা। এম এল এ তো শুধু এম এল এ নয়, ইনি আবার মন্ত্রী— তাই টাকা মার যাবার কোনো কারণ নেই।” “কত দিতে হবে?” “তা আট লাখ তো নিশ্চয়ই।” “আ....ট লা...খ?”—আকাশ থেকে পড়ে রেজা। রেজা দিতে পারবে না বুঝতে পেরে হাসতে হাসতে চলে যায় মহিম।

পরে গোপনসূত্রে কানে আসে প্রার্থী পিছু দুই থেকে আড়াই লাখ ছিল মহিমের। শুধু তাই নয়। ইনাম স্বরূপ পায় তার উপযুক্ত একটা চাকরি আর উপরি হিসাবে পায় এলাকার দায়িত্বের মৌরসী পাট্টা। ওপর-বাবুদের বদান্যতায় কয়েকজন মস্তান-দুষ্কৃতিকে হাতে রেখে চোখের সামনে দুর্নীতি করে যাচ্ছে, কিছু বলার জো নেই।

এ দিকে সংসার চালানো দায় হয়ে পড়েছে। মা-র বয়েস বাড়ছে। আজ এ অসুখ, কাল ও অসুখ লেগেই আছে। বাচ্চা মুন্নির ঝামেলা তো আছেই!

এমন সময় ফেরেস্তার মতো হাজির হয় গনি ভাই। “চল্ রেজা, আমার সাথে হরিয়ানায়। আমি যে কারখানায় কাজ করি, সেখানে তোকে লাগিয়ে দেব।”—গনিভাই-এর প্রস্তাব। এ যে অকূল দরিয়ার মাঝে বেঁচে যাওয়ার নাও! একদিন বোঁচকা-বুঁচকি বেঁধে বেরিয়ে পড়ে রেজা গনি ভাইয়ের সাথে—মিশন হরিয়ানা।

বছর খানেক বেশ চলল হরিয়ানার কারখানায়। যদিও ছোটো কারখানা—তবুও শান্তি ছিল। টাকা-পয়সা ঠিকমত পাওয়া যেত। কিন্তু এ সুখ বেশিদিন টিকল না—মোদীজীর জি. এস. টি-র ঠেলায়। কিছুদিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চালালেও মালিক একদিন তাঁর কারখানা তুলে দিতে বাধ্য হলেন। আবার বেকারত্ব! হরিয়ানায় চাষ-আবাদের মজুরের বেশ চাহিদা। গনিভাই-য়ের সাথে পরামর্শ করে মজুরের কাজে লেগে পড়ে রেজা।

হরিয়ানার টাকায় আর মল্লিক বাড়ির ঝি-গিরির টাকায় নিশ্চিন্তে সংসার চালাতে থাকে মানসারা। ছেলে-মেয়ের-বিশেষ করে মুন্নির যাবতীয় আব্দার মেটাতে কোনো বেগ পেতে হয় না মানসারাকে। ইদানিং মল্লিক বাড়িতে একটা কথা প্রায় সে শোনে করোনার কথা। প্রথমে সে বুঝতে পারত না—করোনা কী! শিগগির সে বুঝল যে, করোনা একটা রোগ---ভীষণ-ভয়ানক রোগ। এ রোগের নাকি কোনো ওষুধ নেই। পাড়ামায়, এমন কি, যেখানেই সে যায়, এই রোগের আলোচনা শোনে। এ নাকি ছোঁয়াচে রোগ—যার ধরে সে বাঁচে না।

একদিন সে শুনলো, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে একদিন বাড়ি বন্দি হয়ে থাকতে হবে—বাড়ির বাইরে বের হওয়া যাবে না। একে নাকি জনতা কার্ফু বলে। শুধু তাই না, বিকেল পাঁচটার সময় আবার নাকি হাততালি দিতে হবে। কাঁসর-ঘন্টা বাজাতে হবে। এতে নাকি করোনা দমে যাবে। কী জানি বাপু - বাপের বয়েসে এমন কথা শুনিনি।—ভাবে মানসারা। যাইহোক, গ্রামের আর পাঁচ জনের মতো মানসারাও ঘর-বন্দি থাকে। ওমা! সত্যি সত্যি বিকেলে হরেন কাকুদের বাড়ির ওদিক থেকে কাঁসর ঘন্টার আওয়াজ সে শুনতে পায়। শুধু তাই? সামনের রাস্তা দিয়ে একদল লোক “জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম” বলতে বলতে মিছিল করে চলে যায়—কেউ কেউ চটপট আওয়াজে তালি দিতে দিতে যায়, কেউ কেউ থালা, বাসন, কাঁসর, ঘন্টা বাজাতে বাজাতে যায়। রাস্তায় গিয়ে দৃশ্যটা একটু ভালো করে দেখবে মানসারা তারও উপায় নেই! পাড়ার ছেলেরা বারবার করে

হুঁশিয়ারী দিয়ে গেছে যে! যাক্‌গে, মানে মানে করোনাটা পালালেই সে বাঁচে।

পরদিন থেকে আবার সে মল্লিকবাড়ি যেতে থাকে। মাত্র ক-টা দিন! সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে মানসারা রান্না বান্না সেরে নিয়ে শাশুড়িকে খেতে দিয়ে রোহন আর মুন্নিকে খাওয়াতে বসায়। পাশের বাড়ির ছেলেরা কল্‌কল্‌ করে কিছু বলাবলি করতে থাকে। শাশুড়ি বলে ওঠে—“বৌমা, ছেলেরা কী বলতেছে, দ্যাখ্‌তো। “মানসারা উঠে যায়।” কী হয়েছে রে বাবলু?” জিজ্ঞেস করে মানসারা।” আজ রাত বারোটা থেকে লক্‌ডাউন ঘোষণা করেছে প্রধানমন্ত্রী একুশ দিনের জন্য।” উত্তর দেয় বাবলু। “লক ডাউন? সে আবার কী?” অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে মানসারা। ব্যাখ্যা করে লিয়াকত—“তার মানে ভাবী, কেউ বাইরে বের হতে পারবে না, হাট, বাজার, স্কুল,অফিস, আদালত, গাড়ি-ঘোড়া—সব বন্ধ থাকবে এই একুশ দিন।” “তাহলে লোকের দিন চলবে কী করে”—সন্দেহ প্রকাশ করে মানসারা। “দিন ঠিক পার হবে ভাবী, তবে লোকের কীভাবে চলবে সেটা চিন্তার, সেটা দেখার।”— বিজ্ঞ দার্শনিকের মতো বলে লিয়াকত। সকলে হাসতে থাকে। একরাশ ভাবনা মাথায় নিয়ে ছেলেমেয়েদের কাছে ফিরে আসে মানসারা।

পরদিন থেকে সত্যি সত্যি দেখা গেল গাড়িটাড়ি চলছে না, রাস্তা শুনশান। পাড়ার চা-দোকানটা খোলা ছিল। বরাবরের মতো আজও কিন্তু খরিদ্দারদের ভিড় ছিল।তবে বেলা হতে পুলিশ এসে সকলকে তাড়া মারে, দোকানের ঝাঁপ ফেলে দিয়ে যায়। মানসারা দেখে, বাড়ি বাড়িতে যেন ছুটি ছুটি ভাব। অনেক দিন পর যেন সবাই খোশগল্পে মেতে ওঠে। ধীরে ধীরে মানসারা জেনে যায় লকডাউনের অনেক কথা। লোকেরা একসঙ্গো থাকতে পারবে না—একজন থেকে আর একজন যেন অন্তত তিনচার ফুট দূরে দূরে থাকে। কারণ, করোনা ভাইরাস তো-মারাত্মক জিনিস। অবশ্য ভাইরাস কী তা মানসারা বুঝে উঠতে পারছে না। লিয়াকত বলেছিল—“খুব দরকারে বাইরে যেতে হলে বা কোন রোগীর কাছে গেলে মুখে অবশ্যই ‘মাস্ক’ পরতে হবে।” মানসারা শোনে আর অবাক হয় -কত নতুন নতুন কথা না সে শুনছে। তাই ‘মাস্ক’ কী তা জানতে চায় সে। “মাস্ক হ’ল মুখোশ—নানান ধরনের কাপড়ের দু-তিনসেট পরদা দিয়ে তৈরি হয় মাস্ক। নাকমুখ ঢাকা থাকবে, শ্বাস-প্রশ্বাস চলবে অথচ নিজে হাঁচলে কাশলে বা অপরে হাঁচলে-কাশলে কোনো জীবাণু সহজে বের হতে বা ঢুকতে পারবে না। “ও ব্বাবা, ওসব জিনিস পাব কোথায়, আর টাকা কোথায়?” অবাক হয়ে প্রশ্ন করে মানসারা। সমাধান দেয় বাবলু—“যারা মাস্ক যোগাড় করতে পারবে না, তারা পরিস্কার কাপড় বা রুমালে মুখ বেঁধে বাইরে যাবে।” এত কিছু জানতে জানতে মানসারার মনে হচ্ছে সে যেন জ্ঞান বুড়ি হয়ে যাচ্ছে।

বুড়ো শাশুড়ি আর রোহন-মুন্নিকে নিয়ে ঘর-বন্দি হয়ে থাকতে চেষ্টা করে মানসারা। রোহন-মুন্নিকে আটকে রাখা যে কী দায় তা হাড়ে হাড়ে টের পায় সে। সামান্য ফাঁক পেলে তারা ছুটে চলে যায় যে-যার সাথিদের সাথে খেলা করতে। তবুও সে চেষ্টা করতে থাকে ওদেরকে বাড়িতে রাখতে। নানারকম প্রলোভন দেখায়, শেষে ভয়ও দেখায় করোনার মারাত্মক ফল নিয়ে। শুধু তাই নয়, আশ-পাশের বাড়ির মেয়েদেরও বোঝাতে চেষ্টা করে—করোনার কুফল ও তার প্রতিকারের বিষয়ে লকডাউনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে—যা সে ছেলেদের মুখ থেকে শুনেছে। মানসারার বোঝানোর ভঙ্গী ও যুক্তি এত সুন্দর যে ছেলেরা বলাবলি করতে থাকে—“ভাবী এত ভালো করে কী করে বলে বল্‌তো?” “হবে না? ভাবীর পেটে বিদ্যে আছে যে!” প্রশংসা করে মুর্শেদ।

যতই সে করোনা লকডাউন নিয়ে “সচেতনতার প্রচার করুক না কেন, মনটা তার বড়ো আনচান করে রেজার জন্য। কোথায় আছে, কী করছে লোকটা —কিছুই জানতে পারছে না! সারা দেশময় কোথাও কোনো গাড়ি-ঘোড়া চলছে না, রেলও বন্ধ। তাই নাকি বিভিন্ন রাজ্য থেকে লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক হেঁটে হেঁটে যে-যার রাজ্যে ফিরে যাবার চেষ্টা করছে। ছেলেরা পেপার পড়তে পড়তে আলোচনা করছিল—মানসারা তা শুনেছে। আগে বুঝত না,এখন সে বুঝতে পারছে—এক রাজ্যের যে-সব লোক রুজি-রুটির জন্য ভিনরাজ্যে গিয়ে মজুর খাটে, তাদের নাকি বলে পরিযায়ী শ্রমিক। যাইহোক, মানসারার বুকটা কেমন ছ্যাঁৎ করে ওঠে। তার রেজাও কি তবে হেঁটে হেঁটে আসছে? সে আরো শুনেছে যে, মালিকরা নাকি শ্রমিকদের ঠিকমতো পয়সাকড়িও দিতে পারেনি। তাহলে রেজা আসছে কী করে, খাচ্ছে কী? “আঃ, মুন্নির বাপ আমার!” —বলে হঠাৎ অজান্তে আর্তনাদ বের হয় মানসারার মুখ থেকে।

মনমরা হয়ে থাকে মানসারা। দিনের মধ্যে বারকয়েক করে ফোন লাগায় মুন্নির বাপকে। ওপার থেকে কোনো সাড়া পায় না। চিন্তা তাতে উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। শাশুড়িও মাঝে মাঝে জানতে চায় ছেলের কথা। কিন্তু কী করে বুড়ো মানুষকে সে বলবে যে, তার ছেলেকে ফোনে ধরতে পারছে না! এদিকে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা—ঘরে চাল-ডাল যা ছিল—সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। অন্ন সংস্থান যে তার মতো অনেকেরই শেষ হয়ে যাচ্ছে বা গেছে—মানসারা তা বেশ বুঝতে পারছে। তাই তারা এর তার কাছে হাত পাতছে—কেউ দিচ্ছে, কেউ দিচ্ছে না, কেউ বা দিতে পারছে না।

মহা ফাঁপরে মানসারা। রান্না-রসদের দৈনিক বরাদ্দ কাটছাঁট করতে থাকে সে। নিজের ক্ষেত্রে আরো কমায়, অর্থাৎ আধ-পেটা খেয়ে বাকিটা পানি পানে পূরণ করে। কিন্তু এভাবেই বা ক-দিন চলবে! চিন্তা তার বাড়তে থাকে। এদিকে পাশের ফাঁকা রকে

উঠতি বয়েসের ছোঁড়াদের আড্ডার মাত্রা যেন বেড়ে যায়। এত অল্প বয়সে কী করে যে এত ভারী ভারী কথা শিখেছে—তা ভাবতে অবাক লাগে মানসারার। অবশ্য এদেরই কল্যাণে তো সে নিজেই করোনা-লাকডাউন সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছে। সাধারণ মানুষের জন্য সরকার কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে বা নিতে চায়—তাও এদের আলোচনায় থাকে। মানসারাও কিছু জেনে যায়। তবে যা-কিছু শুনছে বাস্তবে কিন্তু সে তা দেখতে পাচ্ছে না। আজকের আলোচনায় সে যেন শুনতে পায় যে, আজ রাতে ইলেকটিরির আলো বন্ধ রেখে মোমবাতি জ্বালাতে হবে। সাংসারিক অনটন আর মুন্নির বাপের কোনো খবর না পাওয়ার চিন্তায় সে বিভোর হয়েছিল। কানের কাছে ডেঁপোদের ঐসব আলোচনায় তার চিন্তায় ছেদ পড়ে। কৌতুহলী হয়ে সে উঠে যায় ওদের কাছে। “কী হয়েচে রে? মোমবাতি জ্বালাতে হবে কেন ---ব্যাপারখানা কী বলত?”--- সে শুধায়। লিয়াকত বলে—“ঐ দ্যাখো ভাবী, তুমি শোননি? আজ ক-দিন ধরে তো এই আলোচনা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছে—৫ই এপ্রিল, মানে আজ রাত নটার সময় ইলেট্রিক আলো বন্ধ করে মোমবাতি বা প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হবে ন-মিনিট ধরে। এতে নাকি করোনার ভাইরাস দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে।” “তাই নাকি?” সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা। “কী জানি! তবে অনেক নামী নামী লোক এসব মানেন নি।”—লিয়াকতের উত্তর। “চুপ কর দিকি, যত্তোসব ভড়ং বাজি, বড়ো বড়ো নেতাদের কথা শুনিস নি—আসলে এই তারিখে নাকি প্রধানমন্ত্রীদের দলের জন্ম হয়েছিল?”—উষ্মার সাথে বলে আক্রাম। মানসারার নজর যায় আক্রামের দিকে। এই সেই আক্রাম—ভোটের সময় এদের সঙ্গে আমাদের খুব টক্কর হয়েছিল! হেরে গেল বেচারারা। তবে এরা বেশ স্পষ্ট বলে, যুক্তি দে' বলে! এটা ভেবে সে অবাক হয় যে, আক্রাম-লিয়াকতরা এক জায়গায় হ'ল কী করে! তবে কী করোনা সকলকে এক জায়গায় এনেছে? যাক তো, একদিক থেকে বোধহয় ভালোই হয়েছে—যা সব সময় আক্রামরা চাইত, কিন্তু আমরা চাইনি।

রাতে মানসারাদের পাড়ায় অবশ্য নটার সময় আলো বন্ধ হতে দেখা যায়নি। তবে হারু কাকাদের পাড়ায় অনেক বাড়িতে আলো জ্বলতে দেখা যায়নি। সকালে উঠে শোনা গেল যে, কয়েকজনে মিলে নিবারণ দুলেকে খুব মারধর করেছে—তার দোষ, সে কেন ইলেকট্রিক আলো বন্ধ করে নি, মোমবাতি জ্বালায়নি।

মানসারা মিনিটে মিনিটে ফোন লাগায় মুন্নির বাপকে—কিন্তু কিছুতেই লাগছে না। রকে আড্ডা বেশ জমে উঠেছে। ভাবী কিছু সময়ের জন্য হলেও আড্ডায় যোগ দিত। অল্প কথা বলে ভাবী—কিন্তু বেশ গুছিয়ে, ভেবে চিন্তে। তাই ভালো লাগে সবার। আজ কেন আসছে না—কৌতুহল জাগায় লিয়াকত আর বসির উঠে যায় ভাবীর ওখানে, পেছনে পেছনে যায় আক্রাম আর বেবি। ভাবীর তন্ময় হয়ে ফোন লাগানোর চেষ্টা দেখে বসির জিজ্ঞেস করে—“ভাবী, কাকে ফোন করছ? ধরছে না? বোধহয় নেটওয়ার্ক-এর গোলমাল।” “দ্যাখনা, আজ ক-দিন ধরে তোদের ভাইজানকে ধরতে চেষ্টা করছি মোটেই ধরতে পারছি না?' আর সে লোকও করছে না!” হতাশ হয়ে জবাব দেয় মানসারা। “পেপারে তো দেখছি পরিযায়ী শ্রমিকরা বাধ্য হয়ে হেঁটে হেঁটে আসতে চেষ্টা করছে। ভাইজান হয় তো সে রকম ভাবে আসতে চেষ্টা করছে।”---আনুমানিক উত্তর আক্রামের। “আরো দেখেছিস, এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে এলে পুলিশ কীভাবে মারধর করছে খারাপ ব্যবহার করছে?” সংযোজন লিয়াকতের। বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে মানসারার। ডুকরে কেঁদে উঠতে চায় তার মনটা। বসির বলে—“হরিয়ানা থেকে শ' শ' মাইল হেঁটে আসা কি চাট্টিখানা কথা?” “কী করবে বল? ওদের মালিকরা তো আর বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে না। শুধু রেজা ভাইজান একা তো নয়—ও রকম লক্ষ লক্ষ মানুষ সারা ভারতে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে রয়েছে। তাদের সবার একই দশা—সবাই হাঁটছে।”— লিয়াকত বলে। “কোনো কোনো রাজ্য সরকার, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই সব শ্রমিকদের খাওয়াবার চেষ্টা করছে, আবার কোনো কোনো রাজ্য সরকার তার পুলিশ দিয়ে পেটাচ্ছে।”—অনুযোগ করে আক্রাম। চোখে সর্ষেফুল দেখে মানসারা। তার মুন্নির বাপ এখন কী করছে, কী অবস্থায় আছে—ভাবতেই যে কুঁকড়ে যায় সে। “বৌমা, আয় না মা, আর যে খিদে সইতে পারছি না।”— কাতর ডাক ক্ষুধার্ত শাশুড়ির। বে-হদিশ স্বামী আর ক্ষুধার্ত-অশক্ত শাশুড়ি—এই জোড়া ফলায় বুকটা ভেঙে যায় মানসারার। বাধ্য হয়ে সে একটা অন্যায় করে ফেলেছে—গোটাকতক পান্তা ছিল, তা রোহন-মুন্নিকে দেয়, শাশুড়িকে দিতে পারেনি। ভেবেছিল, কিছু একটা জোগাড় করে বুড়োমানুষটাকে খেতে দেবে। যাইহোক, ক'টা টাকা আঁচলে বাঁধা ছিল—তা দিয়ে লাল চা-বিস্কুট কিনতে চলে গেল। আসল চা-দোকানে তো পুলিশ এসে ঝাঁপ ফেলে দিয়ে গেছে। পাড়ার এক নিরিবিলি জায়গায় একজন লাল চায়ের দোকান দেয়—বিক্রিও হচ্ছে বেশ! রাস্তা টপ্‌কে যেতে হবে চা আনতে। থানার লোকেরা প্রচার করতে করতে যায়—“এ লড়াই সবার—করোনার ভাইরাসকে হারাতেই হবে—যদিও কষ্ট হবে খুব—তবুও আমরা ঘরবন্দী হয়ে থাকব—খুব দরকার হলে যদি বাড়ির বাইরে যেতে হয়, তাহলে অবশ্যই মুখে মাস্ক পরুন, নিদেনপক্ষে কাপড়ে মুখ ঢাকুন।” মানসারা ভাবতে ভাবতে রাস্তা পার হয়—“যারা এই প্রচার করছে—ওরাও কী আমাদের মতো কষ্ট সহ্য করছে?”

কী করে দিন চালাবে তা নিয়ে চিন্তায় অস্থির মানসারা। ঘরে যা ছিল তা দিয়ে কোনোরকমে পানি আমানি করে চালিয়েছে। কিন্তু এখনতো ঘরে বাড়ন্ত, আবার হাতও ফাঁকা।

কার কাছে হাত পাতবে সে! পালান, মুনির, শাম, যুবিদ—কার নাম ভাববে—বস্তির সাত আট জন যারা যারা অটো চৌটো চালাত—পনেরো-কুড়ি দিন সকলহৈ বস্‌তি। নাপিতের অভাবে হোক বা পয়সার অভাবে হোক, সবারি মাথা-মুখ চুল দড়িতে ভর্তি, মুখ শুক্‌নো। চলাফেরায় সে জৌলুস—সে ক্ষমতা যেন তারা হারিয়ে ফেলেছে—ব্যবহারে তারা যেন কেমন খেঁকি হয়ে গেছে। রোহন, মুন্নী আর বুড়ো মানুষটাকে এত বেলা পর্যন্ত সে কিছু খেতে দিতে পারেনি। বাধ্য হয়ে লক্ষ্মীর ভাঁড়টা সে ভাঙে। মাত্র শ'দেড়েক টাকা! তা থেকে কিছু নিয়ে সে দোকানের পথে পা বাড়ায়। এমন সময় ফোনটা বেজে ওঠে। সে ছোটে ফোনটা ধরতে বুকভরা আশা নিয়ে—নিশ্চয়ই মুন্নির বাপ! ওমা! এ তো রাহিলা! তার ছোট বেলার সই! এতদিনে তাহলে সে সময় পেয়েছে করোনার দৌলতে! ফোন ধরল— কুশল বিনিময় হ'ল—আসল কথায় মাথা ঘুরে যাওয়ার যোগাড়। মানসারার বরের মতো রাহিলার বরও বাইরে থাকে! লকডাউনের কবলে পড়ে সে আসতেও পারে নি, টাকা পাঠাতে পারে নি। এমন কাউকে সে পাচ্ছে না—যার কাছে হাত পাতবে। তাই দুটো ছেলেকে নিয়ে যেন সে অথৈ পানিতে ডুবতে বসেছে! এই সংকটকালে বন্ধুর কথা মনে পড়তে সে ফোন করেছে—যদিও সে ভালো করেই বোঝে যে, এতদূর থেকে বন্ধু কিছু করতে পারবে না—শুধু মনটাকে হালকা করতেই তার এই ফোন করা। শেষে “হায় আল্লা” বলে ফোন কেটে দিয়ে দোকানের পথে পা বাড়ায় মানসারা।

যেতে যেতে তার খালি মনে হয়—এ কেমন ধারা ব্যবস্থা! করোনায় দেশ উজাড় হতে পারে - এটা যেমন ঠিক - কিন্তু ঘরে বন্দি থেকে আমাদেরও তো মরে যাবার যোগাড়! কী জানি বাপু, এ কেমন ব্যবস্থা! ভাবতে ভাবতে আড্ডা-রকের পাশে আসে সে। যথারীতি আড্ডাবাজেরাও আছে। তাদের পাশে আনন্দবাজার পত্রিকা। মানসারার নজরে পড়ে বড় অক্ষরে একটা লাইন—“কেরলের কাছে শিক্ষা নিক সকলে।” কৌতুহল হ'ল মানসারার। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে ঐ লাইনটার দিকে—“হ্যাঁরে, একথাটার মানে কী রে, একটু বুঝিয়ে বলত।” লিয়াকত বলে---“আক্রাম, তুই ভালো গুছিয়ে বলতে পারিস—ছোট্ট করে বলতো ভাবীকে।” আক্রাম শুরু করে—“জান ভাবী, করোনা ব্যাপারে অন্যান্য রাজ্য থেকে কেরল রাজ্যের সরকার খুব ভালো কাজ করছে।” “কেন, কেরল সরকার ডাক্তার নাকি?”—শুরুতেই জানতে চায় ভাবী। “না না,শুনবে তো! করোনার যে-যে লক্ষ্মণ আছে—ঐ ধরনের লক্ষ্মণ যাদের দেখা দিচ্ছে বা সন্দেহ হচ্ছে—সকলকেই পরীক্ষা করছে, আর প্রয়োজন মতো ব্যবস্থা নিচ্ছে। এর জন্য প্রচুর হাসপাতাল বা সেন্টার খুলেছে। হাজার হাজার লোকের পরীক্ষা হ'চ্ছে প্রয়োজনে চিকিৎসা চলছে—তাই তো ওখানে সবাই আরোগ্যের পথে। মারা গেছে মাত্র দুজন—যেখানে অন্য রাজ্যে প্রচুর লোক মরছে।” “তা ওখানে, আমাদের মতো লক্‌ডাউন হচ্ছে? বাইরে বেরোতে দেয় না?” ভাবী জানতে চায়। “ওখানকার লোকেরা আমাদের থেকে বেশি করে লক ডাউন মেনে চলে—সচরাচর কেউ বের হয় না।” “সে কি, তাহলে ওদের চলে কী করে? বাজারে টাজারে যেতে হয় না?” “না, ওদের বাজারে যেতে হয় না। সরকারের লোক বিনা পয়সায় লোকেদের বাড়ি বাড়ি খাবার সামগ্রী এমন কি ওষুধ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। শুধু তাই নয়, ভিন রাজ্যের মানুষ—যারা কাজ করতে গিয়ে ওখানে আটকে পড়েছে—তাদেরকে রান্না করা খাবার, ওষুধ ইত্যাদি দিচ্ছে। তাই পেপারে লিখেছে যে, কেরল সরকার যদি এসব করতে পারে, অন্যান্য রাজ্য সরকার কেন পারবে না।” অবাক হয়ে যায় মানসারা । সঙ্গে সঙ্গে তার চিন্তা ওদিকে ঘুরে যায়—“আমার মুন্নির বাপের কী হচ্ছে?”— আশা-আশংকার দোলাচলে সে স্থান ত্যাগ করে দোকানে যায়।

টেনে-কষে চলল দুদিন। আর কোনোদিকে কোনো চারা খুঁজে পায় না মানসারা। রোহন বুঝতে পারছে বোধহয় কিছুটা। তাই তার উৎপাত তত মারাত্মক নয়। কিন্তু মুন্নিকে সামলানো যাচ্ছে না। খিদে পেলে সে আছাড় খায়—মা হয়ে মেয়ের এই খিদের জ্বালা কী করে সহ্য করতে পারে। এছাড়া বুড়ো শাশুড়ি সব বুঝতে পারছে—তাই চুপ থাকে—কিন্তু তার অসহায় চোখের দিকে তাকালে মানসারার বুক যেন ভেঙে যায়! বিনি-পয়সার রেশন দেওয়া যদিও শুরু হয়েছে—কিন্তু একার্ড তাদের নেই। আছে একটা মাত্র কার্ড শাশুড়ির নামে—তাও সাদা, তের টাকা কেজির চাল। কাছে কোনো টাকা নেই—তাই চালটাও ধরা যাচ্ছে না। লিয়াকতকে সঙ্গে নিয়ে সে মহিমের কাছে অনেকবার দরবার করেছে আর, কে, এস, ওয়াই কার্ডের জন্য। শুধু আশ্বাস ছাড়া কিছুই পায়নি। এবারে একটা আশার বাণী শুনেছিল যে, যাদের কার্ড নেই, তাদের কে কুপন দেওয়া হবে—কুপন দেখালে রেশন দোকান থেকে মাল পাবে। এর জন্য সে লিয়াকতকে দিয়ে ফরম্ ভর্তি করিয়ে জমা দিয়েছিল। কুপন এল। বন্টনের ভার মহিমের ওপর। কেউ পায়, কেউ পায় না—এমনকি মানসারাও পায় না। আড্ডা-রকে এ বিষয়ে আলোচনায় আক্রাম লিয়াকতকে জিজ্ঞেস করে “হ্যাঁরে, আমরা তোদের বিরুদ্ধে বলে না নয়, আমাদের বেশির ভাগকে তোরা কুপন দিসনি, কিন্তু ভাবীরা তো তোদের দলের, এরা পেল না কেন?” বিব্রত হয় লিয়াকত। ভাবীরা কুপন না পাওয়ায় সে নিজে খুব লজ্জিত, অবাক, ক্ষুব্ধ। তাই সে আমতা করে—“না, মানে, আমি ঠিক বলতে পারছি না, খোঁজ নেব, মহিম ভাইকে বলব।”

এই দুঃসময়ে কুপন যে তার কাছে কত মহার্ঘ বস্তু, আর তা না পাওয়ায় সে যে কত ব্যথিত তা মানসারা কাউকে বোঝাতে পারে না! সে আরো ব্যথিত এই কারণে যে, সে বুঝে উঠতে

পারছে না, তাদের প্রতি মহিম এত বিরূপ কেন? সে ভেবে আশ্চর্য হয় যে, মহিমের মতো অনেক মহিম বাংলায় গরীব মানুষের কুপন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। আল্লা এদের সুমতি দিক!

চিকন মাসি, হাবুর মা, হাজরা চাচি—এরকম পাঁচ ছয় মহিলা একজায়গায় জটলা করে সুখ-দুঃখের কথা বলাবলি করছিল। মানসারা ওখান দিয়ে যাচ্ছিল মল্লিক বাড়ির দিকে—তার কয়েকদিনের মজুরি পাওনা আছে—যদি পাওয়া যায়। জটলা দেখে থমকে দাঁড়ায়—''কী ব্যাপার গো সব, অমন মুখোমুখী দাঁড়িয়ে খালি মুখে কী সব কথা হচ্ছে? জান না, বাইরে বের হলে মুখে কাপড়-চোপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়?''—''না রে মা, আমরা তো খুব বাইরে যাই নি''—বলে হাসতে থাকে হাজরা চাচি।'' ''না গো চাচি, শুনছনি, কত বারবার করে মুখ ঢাকতে বলছে—বিপদ কখন কোত্থেকে আসবে কেউ বলতে পারে না। তা কী কথা হচ্ছে তোমাদের?'' জিজ্ঞেস করে মানসারা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে চিকন মাসি—''কী বলব গো মা, চেকনের কাজ করে সামান্য কিছু পেতুম - তা দে' বালবাচ্চাদের কোনো রকমে পানি আমানি করে খাওয়াতুম। এ্যাদ্দিন হ'লো, কাজ কাম সব বন্ধ—বুঝতে তো পারছ—কী অবস্থায় আছি সব?'' মানসারা সব বুঝতে পারে—আর পারবে না-ই বা কেন, সে নিজেই তো ভুক্তভোগী! ''তুই কোথায় যাচ্ছিস রে মা?''—জানতে চায় হাবুর মা। ''আমি একটু মল্লিকবাড়ি যাচ্ছি চাচি—কিছু পাই কী দেখি।''—মানসারা উত্তর দেয়। ''তোর তবু চাইবার জায়গা আছে মা''— নির্লিপ্তভাবে বলে কেলোর মা চাচি। ''আগে যাই তো দেখি!''—বলে মানসারা হাঁটা দেয়। মনে মনে ভাবে—যদি সে কিছু পায় তা থেকে এদের কিছু সাহায্য করা যায় কি না।

মানসারা যখন পৌঁছলো---তার ভাগ্য ভালো বলতে হবে—মল্লিক গিন্নী তখন গেটের বাইরে খামারে কী জানি কী করছিলেন। ''চাচিমা, কেমন আছ?''—প্রশ্ন করে মানসারা। চমকে ঘুরে দাঁড়ায় চাচিমা—''এ্যা, কে? ও তুই? এ সময়ে তুই কেন এখানে। বলি তোর কি মরবার ভয়নি লো?'' ''আমরা মরলে কী, বাঁচলেই বা কী চাচি? পরে যাতে না মরে তার জন্যি আমরা এ্যাদ্দিন বের হইনি।'' শ্লেষ করে বলে মানসারা। ''কী কথার ছিরি দ্যাখ! তা কী জন্যি এয়েচিস বললি নি তো?'' ''বলছিলুম কী চাচি, বাড়িতে খুব অসুবিধে যাচ্ছে''— ইঙ্গিত দেয় মানসারা। ''অসুবিধে তো আমি কী করব, দুইনা শুদ্ধ তো অসুবিধায় আছে?''—খেঁকিয়ে ওঠে চাচি ''না, বলছিলুম কী—আমার তো কিছু পাওনা আছে—'' আমতা আমতা করে বলে মানসারা। ''কী, ক-দিনের পয়সা পাও বলে আমায় খোঁটা দিচ্ছ, ওরকম কত পয়সা আমরা ভিখিরিকে দিই। যা যা, বন্দীর বাজার খুলে গেলে নে যাস তোর পয়সাকড়ি''—বলে হনহন করে ঢুকে গিয়ে গেট দড়াম করে বন্ধ করে দেয় চাচি। অবাক হয়ে বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ধপ্ করে বসে পড়ে মানসারা।

কতক্ষণ, সে নিজেই বুঝতে পারে না। হঠাৎ করে গেট খোলার আওয়াজে তার হুঁশ ফেরে। দেখে, কর্তাবাবু। আশায় বুখ বাঁধে মানসারা। ''কে রে, মুন্নির মা? কী মনে করে?''—চাচার প্রশ্ন। চাচির সঙ্গে সব কথাবার্তা বলে মানসারা। চাচা বললেন---''কী বলি বলতো মা? এটা তো তোর চাচির ডিপাটমেন—আমি কী বলব বল?''—বলে বাইরে চলে গেলেন।

আরো যেন হতাশায় ভেঙে পড়ে সে। কী করবে বুঝতে পারে না। রোহন-মুন্নি আর বুড়ো শাশুড়ি খিদেয় অস্থির হয়ে যাচ্ছে। যদিও ক-দিন ধরে আধপেটা খেয়ে বা অনেকবেলা উপোষ করে করে তার শরীরও বেশ দুর্বল হয়ে গেছে—এমন কি পা টানতেও কষ্ট হচ্ছে। দু-চোখে যেন তার আঁধার ঘনিয়ে আসতে থাকে। তার সম্বিত ফেরে—গিন্নী-মার বড় বৌমার ত্রস্তপদে আগমনে। মানসারার বুকটা কেঁপে ওঠে—এ আবার কী না কী বলে ফেলে! চারদিকে ভয়ভয় চোখে তাকিয়ে সে বলল—''মুন্নির মা বুবু, আমি তোমাদের সব কথা শুনিছি। আমার শাশুড়ি বা শ্বশুরের তোমাকে ওভাবে বলা ঠিক হয়নি। যে-লোক এ্যাদ্দিন ধরে জানপ্রাণ দে কাজ করে গেল, আজ এই দুঃসময়ে সাহায্য করতে না পারুক,তার পাওনা টাকা পর্যন্ত দিল না? আর আমার শ্বশুরটাকেও দেখ, এই বুড়ো বয়সেও কেমন বৌ-এর ন্যাওটা হয়ে আছে! যাইহোক বুবু, আমি এখেনে বেশিক্ষণ দাঁড়াতি পারবু নি, আমার কাছে সামান্য যা ছিল তোমায় দিচ্ছি, ছোট বুনের দেওয়া এই ছোট্ট সাহায্যটা যদি নও, তাহলি তোমার এই বুনটা খুব খুশি হবে। না, না, এটা তোমার পাওনা থেকে কাটা যাবে না।''—বলে তার হাতের মধ্যের লুকোনো টাকাটা জোর করে মানসারার হাতে গুঁজে দিয়ে সেই রকম ত্রস্তপায়ে চলে গেল। মানসারা বিস্ময়ে চেয়ে থাকে এই গোবরের মধ্যে পদ্মফুলের দিকে। অকুলে কুল পায় সে। গুনে দেখে চারশ! খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকে। প্রথমে সে চিকন মাসিদের ছ'জনকে ডেকে প্রত্যেকের হাতে পঞ্চাশ টাকা করে দেয়, নিজে রাখে একশ টাকা। মাসিরা যেন আশমানের চাঁদ হাতে পায়। সকলে হাত তুলে দোয়া করে—'আল্লা তোমার ভালো করুক মা।'

বাড়ির কাছে এসে দেখে যে রকের ভীড়টা যে বেশি। কী ব্যাপার? মূল যা বুঝল—ও পাড়ার করম সর্দার অভাবের জ্বালা সইতে না পেরে সেঁকো বিষ খেয়েছে। বেচারি টোটো চালিয়ে সামান্য যা উপায় করত তা দিয়ে ছ-সাতজন নেড়িগেঁড়ি নিয়ে সংসারটা কোনো রকমে চলত! এখন কী হবে! তবে বিষ খাবার সময় একজন দেখে ফেলায় তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মনে হয় ভয় কেটে যাবে। করমের অসহায় ছেলেদের মুখ মানসারার কল্পনায় ভেসে ওঠে—ঐ মুখেদের সঙ্গে রোহন মুন্নির মুখও ভেসে ওঠে। বুকটা মোচড় দেয় তার—চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ে।

আজ পয়লা বৈশাখ—নববর্ষ। অন্যান্য বছরে এই দিনে রেজা-মানসারা কত কী না যোগাড় যন্তর করে রান্নাবান্না করত। রোহন-মুন্নিকে নতুন জামা-কাপড় পরাত—আর নানান পদের রান্না শাশুড়ি সহ সকলে একসঙ্গে খেতে বসত। দীর্ঘশ্বাস পড়ে মানসারার । অন্তত আজ দিনটা পেট ভরে খাবার মতো ভাতের চালও যোগাড় করতে পারে নি। ঠিক করেছে, যা-চাল আছে তা দিয়ে বাচ্চা-দুটো আর শাশুড়িকে অন্ততঃ পোন-পেটা খাওয়াবে—নিজের আধ-পেটা হোক আর না-হোক! হারু কাকাদের বাগানে ঝড়ে কয়েকটা কলাগাছ পড়ে গেছে—যাতে কচি বা পুষ্ট কলার কাঁদি ছিল। কাকাকে বলে কচি কলার কাঁদিটা চেয়ে নেয়। রাস্তার ধারের নিমগাছ থেকে কিছু কচি নিম পাতা পাড়িয়ে নেয়—কলা তেতো হবে। মাঠেতে নানান আগাছা হয়েছে—বেছে বেছে কিছু গাছের ডগার পাতা তুলে নেয়—ঘরে দুটো আধশুকনো আলু আছে—তা দিয়ে হবে শাক চচ্চড়ি—পয়লা বোশেখের মহাভোজ! শাক তুলে চলে আসছে, পা যেন আর চলে না! সকাল থেকে পেটে কিছু পড়ে নি। তার ওপর চিন্তা ‘কাল’ তো দূরের কথা—রাতে কী খেতে দেবে ক-টা প্রাণীকে। এমন সময় শুনতে পায় ছেলেরা বলাবলি করছে—প্রধানমন্ত্রী নাকি বলেছে লকডাউন আরো আঠারো-উনিশ দিন বাড়ানো হ’ল—না মানলে জেল জরিমানা দুই-ই হবে। শুনে গা-পিত্তি যে জ্বলে ওঠে মানাসারার। নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারে না সে “ওলাউঠো মিন্‌শে কোথাকার, ভাত দেবার ভাতার নয় কিলোবার ঠাকুর আমার।”

সত্যি সত্যি তার পরদিন অনেক হন্যে হয়ে এদিক-ওদিক, এর কাছে—তার কাছে গিয়েও কোনো সুরাহা পায় না—অর্থাৎ চাল বা আটা কিছু পায় না। বিপদের ওপর বিপদ এলে নাকি মাথার ঠিক থাকে না। মানসারার মতো—শক্ত, পরোপকারী, ঠাণ্ডা মেয়ে সত্যিই আজ দিশেহারা। তার চেনা বলয়ের মধ্যে এমন কাউকে সে দেখতে পাচ্ছে না—যার কাছে সাহায্য চাইতে পারে। মাননীয় মন্ত্রীমশাই নাকি এলাকার দুস্থদের দেওয়ার জন্য টনটন চাল, আলু, ডাল ইত্যাদি এনেছেন। কই তা তো এখনো পাওয়া যায়নি, সে অবশ্য শুনেছে কয়েকজন কিছু পেয়েছে—তবে যারা যারা পেয়েছে, তাদের তো তেমন অসুবিধে নেই। লিয়াকতটা আসুক—জিজ্ঞেস করতে হবে। বিরোধীরা অবশ্য টাকা-পয়সা তুলে গরীবদের মধ্যে ত্রাণ বিলির ব্যবস্থা করছে। মানসারার কাছেও লোক পাঠানো হয়েছিল ত্রাণের দরকার আছে কী না! যতই অভাব থাক, আত্মসম্মান বলে একটা জিনিস আছে তো! ভোটের সময় যাদের দূর-ছাই করত - তাদের কাছে নিজের সুবিধে-অসুবিধে, অভাব নিয়ে কিছু বলে নি - চুপ ছিল।

মানসারা লিয়াকতের কাছে যায়—নিজের অনটনের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলে। বিব্রত হয় লিয়াকত। প্রত্যেকদিন ভাবীর বাড়ির পাশে সকলে আড্ডা দেয়, ভাবীও মাঝে মাঝে আসে—ভাবীর যে এতো অভাব তার বিন্দু বিসর্গও তারা বুঝতে পারে নি! ছি, ছি! সে বলে—“চল ভাবী, মহিমভাই-য়ের কাছে যাই। নিশ্চয়ই একটা বিহিত হবে। বিভিন্ন বিষয়ে এদের প্রতি মহিমের অবহেলা, এড়িয়ে চলা, নানান বিরূপ আচরণে মানসারা মনে মনে খুবই ক্ষুব্ধ। এখন রাগ-অভিমান প্রকাশের সময় নয়। রোহন-মুন্নির খিদের কান্না বিশেষ করে আজ সকালে মুন্নি খিদের চোটে তার শাড়ি ধরে কাঁদতে কাঁদতে টানাটানি করছিল, ছাড়াতে না পেরে সে মুন্নির গালে সপাটে এক চড় কষিয়েছিল। হঠাৎ থেমে যায় মুন্নি, রোহনও কিছু বলতে পারে না—কারণ তারা কখনো মা-র এরকম আচরণ দেখেনি, ক্ষুধার্ত শাশুড়ি কাতরভাবে ডাকে—“আয় বাবারা আয়, আমার কাছে আয়!”—এসব দৃশ্য এখনো তার চোখের সামনে ভাসছে - যখনই এসব মনে ওঠে, সে যেন কুঁকড়ে যায়! তাই সে দ্বিরুক্তি না করে লিয়াকতের পিছু নেয়।

মহিমের বাড়ি পৌঁছে মানসারা দেখে কিছু দুস্থ মেয়ে-পুরুষ চাল-ডাল-আলু ইত্যাদির প্যাকেট নিয়ে চলে যাচ্ছে। তার মনেও আশার আলো জাগে -নিশ্চয়ই আজ সে কিছু পাবে। মহিম জিনিসপত্রের তদারকি করছিল—যে খাতা লিখছিল, মাঝে- মাঝে তার কানে কানে কী সব বলছিল। এদের বাড়িতে ঢুকতে দেখে সহাস্যে মহিম—“আরে, আরে ভাবী যে, ও মনু দেখে যাও কে এসেছে, বসো বসো, লিয়াকত চেয়ারটা এগিয়ে দে ভাবীকে, তুইও একটা চেয়ারে বস্।” প্রথম আপ্যায়নে মোহিত হয়ে যায় এরা। “তারপর ভাবী, বলো কী ব্যাপার।” মানসারা অবাক হয়ে ভাবে—সত্যি কী লোকটা ভুলে গেছে, কীভাবে এদের বঞ্চিত করেছে, নাকি সবই চাতুরী! যাইহোক, তবুও বলে নিজের অভাবের কথা। শুনে সে লিয়াকতের ওপর ধমকে ওঠে—“হ্যাঁরে, তুই আমায় কিছু বলিস নি কেন?” লিয়াকত তোতলাতে থাকে। “আচ্ছা, হয়েছে হয়েছে, সব বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে ভাবী তুমি বিকেলে এসো।” আকাশ থেকে পড়ে মানসারা! কিছু পেলে তবে ছেলে পুলেদের মুখে কিছু দেওয়া যাবে! তাই সে অনুনয় করে ভাই, একটু দয়া কর, এখন যদি কিছু—“শেষ করতে দেয় না মহিম। ভাবীর হাত দুটো ধরে “কিছু কী ভাবী, বলছি তো তুমি বিকেলে এসো, বেশ কিছু হবে।”—বলে হাত দুটোতে একটু চাপ দেয়। এই চাপটা যেন কেমন এক অস্বাভাবিক। লিয়াকত বলে “চলো ভাবী।” দুজনে বেরিয়ে যায়। একে প্রায় অভুক্ত থাকায় শরীর বেশ দুর্বল, তায় এখন রিক্ত হস্ত বলে বোধহয় দুর্বলতা অনেক বেড়ে যায়— খুব কষ্ট করে পা টানতে হচ্ছে। লিয়াকতের নজর এড়ায় না। পাকা রাস্তা ধরে থানার পক্ষ থেকে মাইক প্রচার হচ্ছে—“আপনারা অনেক ক্ষতি, অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনুরোধ করা হচ্ছে সকলের ভালোর জন্য, কোভিড-১৯ কে, মানে করোনা ভাইরাসকে হারাতে অর্থাৎ

আমাদের তথা সারাদেশকে বাঁচাতে আসুন আমরা আবার অতিরিক্ত কটা দিন লকডাউনকে আরো নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলি। মনে রাখবেন, এ লড়াই বাঁচার লড়াই।”

এত দুঃখের মধ্যেও মানসারার মনে মনে হাসি পায় —‘এ লড়াই বাঁচার লড়াই।’ এটা যেন তার কাছে এখন ব্যঙ্গ-প্রহসন মনে হচ্ছে। লিয়াকত বেশ বুঝতে পারছে ভাবীর দুরবস্থাটা। সে দোকান থেকে পাঁচশো গ্রাম মুড়ি আর কিছু বাতাসা কিনে ভাবীকে দেয়। কুণ্ঠিতভাবে ভাবী মুড়ি বাতাসা নেয়—না নিয়ে উপায়ও ছিল না। বিকেলে মহিম ভাইয়ের কাছে যেতে বলে লিয়াকত বিদায় নেয়। ওদিকে মুন্নিরা কী করছে কে জানে! তাড়াতাড়ি হাঁটতে চেষ্টা করে মানসারা। মুড়িটা পেয়ে বোধহয় তার পায় একটু বল বেড়েছে। ‘ঘরপোড়া গরু’,তাই বোধহয় মুড়িটা আধা-আধি ভাগ করে অর্ধেক রেখে বাকি অর্ধেকটা তিনজনকে দেয় মানসারা, অবশ্য তা থেকে দু-একগাল মুখে দিয়ে এক গ্লাস পানি খেয়ে নেয় সে। অনিশ্চিত রাতের আহারকে নিশ্চিত করতে সে এ কাজ করল।

বৈকাল তিনটে-সাড়ে তিনটে বাজে। মুন্নিরা ঘুমোচ্ছে—ক-গাল করে মুড়ি খেয়েছে! শিগগির উঠে কান্নাকাটি জুড়ে দেবে। তার চেয়ে বরং মহিমের কাছে গিয়ে যদি কিছু চাল-ডাল পাওয়া যায়—তাহলে তা রান্না করে ওদের খাওয়ানো যাবে। এই ভেবে মহিমের বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে মানসারা। দেখা হ’ল আক্তারের সঙ্গে। তার দিকে তাকানো যায় না—মাথা-মুখ চুল-গোঁফ দাড়িতে ভর্তি - মুখ শুকনো। কী সুন্দর দেখতে ছিল সে। অটো চালাত। কুড়ি-বাইশদিন চাকা বন্ধ - তাই বোধহয় হাঁড়িও বন্ধ! “কেমন আছ আক্তারভাই”—বুঝতে পেরেও বোধহয় শালীনতা রক্ষায় জিজ্ঞাসা করে মানসারা। ম্লান হেসে উত্তর দেয় আক্তার—“দেখতে তো পাচ্ছ ভাবী, তা কোথায় যাচ্ছ?” “মহিমের বাড়ি”—সংক্ষিপ্ত উত্তর। “যাও, তোমরা একদলের—তোমরা মাল পাবে। দেখ ভাবী, এ সব মাল কিন্তু সাধারণ মানুষের টাকায়— তা নিয়ে তোমরা কেমন দলবাজি করছ।”—ক্ষুব্ধভাবে উগরে দেয় আক্তার। “তুমি যা বলছ—কিছু সত্য, কিছু ভুল ভাই।” “মানে?” —আক্তারের জিজ্ঞাসা। মানসারা বলে—“ভুল এজন্য বলছি যে, একই দলের হলে যে দেবে—তা কই, আমি তো কিছু পাইনি? লিয়াকত নেহাত বলেছে বলে যাচ্ছি—এখন দেখি কী হয়।” “আমাদের ছেলেরা শুনছি চাঁদা তুলছে, গরীবদের সাহায্য করবে—দেখো, তারা কিন্তু পার্টি দেখবে না—গরীব দেখবে। বিপত্তারণ দা সব ব্যবস্থা করছে—আজ কালের মধ্যে সাহায্য এসে যাবে আশা করছি।”—আক্তারের আশা। “তাই যেন হয় ভাই—সকলে ভালো থাকলে, আমার ভালো লাগে, এখন আসি ভাই।” বলে চলে যায় মানসারা।

মহিমের বাড়ি গিয়ে কাউকে দেখতে পায় না মানসারা। “মহিমভাই, মহিমভাই”—বলে ডাকতে থাকে মানসারা। খট্ করে আওয়াজ করে খুলে যায় বেডরুমের দরজাটা। “ভাবী এসো” বলে মহিম ডাকে। ইতস্তত করে মানসারা—“না ভাই, তুমি বাইরে এসো।” ”আরে অত ঘাবড়াচ্ছো কেন? মনু এখানে নেই, তুমি এসো তো।” বলে মানসারাকে ধরে বিছানার ধারে বসিয়ে দেয়। তারপর বাথরুমে যায়। চারদিকে তাকিয়ে দেখে মানসারা। দেখে, খাটের নীচে পঁচিশ কেজি চালের বস্তা থরে থরে সাজানো। কী ব্যাপার! বাইরের ঘরে চাল-আলুর বস্তা। আবার খাটের নীচটা চালের বস্তায় ভর্তি! এটা তাহলে বাবুর নিজস্ব ভাগ! “বেডরুমে কারো ঢোকার পারমিশন নেই ভাবী। তুমি হলে এস্‌পেশাল লোক, তাই।”— ঢুকতে ঢুকতে বলে মহিম। মানসারার ধারণাটা তাহলে ঠিক! পাছে কেউ দেখে ফেলে, তাই ঘরে ঢোকা নিষেধ! মহিম এসে পাশে বসে। মানসারা একটু সরে যায়। বলে “আমার ব্যাপারটা একটু দেখনা ভাই।” “দেখব বলে তো আসতে বলেছি।” “হ্যাঁ ভাই, ছেলে-মেয়ে, বুড়ো শাশুড়ি খিদেয় বিছানা নিয়েছে— ওদের দিকে তাকানো যায় না। একটু দেখো না ভাই। এমন কি কুপন যদি পেতুম তাহলে বিনি পয়সায় কিছু মালও পেতুম।” —মানসারার আকুতি। “দেব, দেব, চাল-ডাল-আলু কুপন—সব ব্যবস্থা করে দেব।”---আশ্বাস দেয় মহিম। খুব খুশি হয় মানসারা। কৃতজ্ঞতা দেখাতে হাত দুটো ধরে। “আরে বলছি তো, সব দেব। তবে তোমাকেও আমায় দেখতে হবে।”—শর্ত দেয় মহিম। “কী দেখতে হবে ভাই, তুমি বলো।”— জিজ্ঞেস করে মানসারা। “আমি তোমার বেবা পেতে চাই”—বলে মহিম বাঁ হাত মানসারার কাঁধে রাখে আর ডান হাত দিয়ে তার থুত্‌নিটা ধরে চুমো খেতে যায়। “সে কি? তুমি কী করছ?” বলে মানসারা সরে যেতে চায়। এবারে মহিম তাকে জড়িয়ে ধরতে ধরতে বলে—“এখানে তো কেউ নেই, অত ভয় পাচ্ছ কেন? এসো।” “আমি ভয় পাচ্ছি না, এখন ঘেন্না হচ্ছে, এই জন্যি বোধহয় আমায় আসতে বলেছিলে?” ফুসতে থাকে সে, যাঁতাকলে আটকে পড়া ইঁদুরের মতো ছটফট করে, কিন্তু ছাড়াতে পারছে না নিজেকে। “বুঝছ না কেন ডার্লিং, ঘরে তোমার অভুক্ত সন্তান-শাশুড়ি, অন্তত তাদের মুখের দিকে চেয়ে আমার কাছে

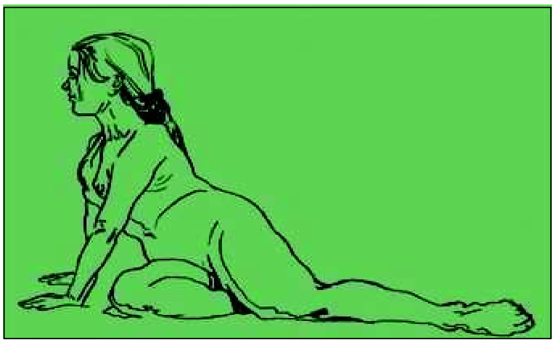

থাকো না কিছুক্ষণ।” মহিমের যুক্তি। রাগে শরীর জ্বলতে থাকে মানসারার। জাপটে ধরে থাকে মহিম। “মহিম ভাই, মহিম ভাই, বাড়িতে আছ?”—কে যেন ডাকছে মহিমকে, শিথিল হয়ে আসে মহিমের বাহুযুগল—নিজেকে মুক্ত করে চলে যেতে পা বাড়ায় মানসারা । “ঠিক আছে, যাও। কথা দিচ্ছি, দরকার মনে করলে খবর দিও —চাল-ডাল নিয়ে হাজির হব।”—স্মরণ করিয়ে দেয় মহিম। সে চলে যেতে আপন মনে মহিম—“কোথায় পালাবে ডার্লিং, খালে তোমার মাথা গলাতেই হবে।”

বাড়ি এসে দেখে সত্যিই কাঁদছে মুন্নি। তাড়াতাড়ি মুড়ি বের করে খেতে দেয় ওদের। পাশ-বাড়ির রাহিলার ছেলেটাও কাঁদছে খিদের জালায়—আসার সময় দেখে এসেছে মানসারা। তাই, মুঠো খানেক মুড়ি নিয়ে দিয়ে আসে ছেলেটাকে। ভাবে—এখনকার মতো তো মিটল সমস্যাটা। সন্ধ্যা হতে এখনো ঘন্টাখানেক বাকি। তারপর রাত। কী করে ওদের মুখে কিছু তুলে দেবে—সেই চিন্তায় সে ব্যাকুল। আবার সে বের হয়ে পড়ে। ঘন্টা খানেক ধরে এ-দোর, ও-দোর করল—একটা কণাও কারো কাছ থেকে পেলো না। খালি হাতে যখন বাড়ি ফিরল তখন সূর্য ডুবু-ডুবু।

সামান্য মুড়ি- কতক্ষণ আর পেটে থাকে। তাই আবার খিদে পায় - আবার কাঁদতে থাকে মুন্নি। এ কান্না ডাকছাড়া নয়, মানে ডাকছাড়ার ক্ষমতা আর নেই—কঁকিয়ে কঁকিয়ে কাঁদছে মুন্নি। রোহনের সে তেজ আর নেই! মিনমিন করে বলে—“মা, আর যে পারছি না।” চোখের সামনে এ দৃশ্যও দেখতে হচ্ছে মানসারার! সে যেন আজ আবিষ্কার করল তার অমন-সুন্দর চেহারার ছেলের এখন হাড় জিরজিরে অবস্থা! কী মনে করে শাশুড়িকে ডাকে “মা, মা”—বার তিনেক ডাকার পর ক্ষীণস্বরে আওয়াজ পায় ‘উঁ’। ওদিকে-রাহিলার ছেলেও করুণ স্বরে কাঁদছে খিদেতে—আরো করুন স্বরে কাঁদছে রাহিলা—“কী করব রে বাবা, কোথায় পাব রে বাবা? আমি যে নাচার।” এই অদ্ভুত মর্মান্তিক করুন পরিবেশে বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে মানসারার—চোখ ফেটে পানি ঝরছে।

এ নরক যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতির পথ খুঁজতে থাকে মানসারা। অনেক ভেবে চিন্তে সে এক অভিনব আত্মহননের পথ নেয়। মহিম যদি তার শরীরটা পেত তাহলে এতক্ষণে হয়তো রান্নাবান্না শুরু হত। যে-নিটোল শরীরের জন্য একসময়ে মানসারার গর্ব হ’ত—সেটাই এখন কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ যেন তার নতুন আত্মদর্শন। এই কালের শরীরের বিনিময়ে যদি এতগুলো প্রাণ বাঁচাতে পারে তা মন্দ কী! জান বাঁচানো ফরজ! আগে জান-পরে মান। সঙ্গো সঙ্গো সে ‘বুল্টি বুল্টি’ ডাকতে ডাকতে বাইরে যায়। বুল্টি হ’ল তার চাচ্‌তো দেওরের মেয়ে। বুল্টি আসে। “হ্যাঁরে মা, তুই একটু তোর মহিম চাচার বাড়ি যা তো, বল্‌বি চাচি তোমায় একটু ডেকেছে।” বুল্টি ছুটে চলে যায়। আপনমনে বিড়বিড় করে বলতে থাকে মানসারা—তুই অবশ্যই আসিস রে হারামির বাচ্চা হারামি। এই শরীর তোর কেমন সব্বনাশ ডেকে আনে দেখিস। এই শরীর দে তোর সব হারামের ধন নিংড়ে নে গরীব গুর্বোদের কেমন বিলুই দেখিশ। এতে আমার পাপ হবে না রে হারামির বাচ্চা-পাপ হবে তোর!

রাগের চোটে গাল-মন্দ, শাপ-শাপান্ত করে সে। বুল্টি এসে খরব দেয় চাচা বলেচে ‘আচ্চা’। অপেক্ষা করতে থাকে সে। ওলাউটোটা যদি একটু তাড়াতাড়ি আসে তাহলে বাচ্চাদের মুখে রাতে কিছু দিতে পারে। সে ধীরে ধীরে মুন্নি-রোহনের মাথায় হাত বুলোতে থাকে। মা-র স্নেহের পরশ পেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে মুন্নি-রোহন। তার মাথায় ঘুরছে কীভাবে হারামির বাচ্চাকে চিট্ করা যায়! সে না করে এসেছে - ওলাউঠো ওকে সহজে বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না। অথচ ওকে বিশ্বাস করাতে না পারলে হারামিকে আচ্ছা-শিক্ষা দেওয়া যাবে না। সে উঠে ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। বিছানাটা তকতকে করে সাজায়। বায়না করায় একবার মুন্নিকে একটা সেন্ট কিনে দিয়েছিল —শিশিতে এখনো একটু আছে—তা থেকে কয়েক ফোঁটা নিয়ে বালিশে লাগিয়ে দেয় আর কয়েক ফোঁটা দেয় ব্লাউজের বুকের অংশে। অবিন্যস্ত চুলকে বিন্যস্ত করে। এক কথায়, যতটা সম্ভব নিজেকে সে মোহময়ী করে তোলার চেষ্টা করে, যাতে তাকে দেখে হারামির বাচ্চার মাথা ঘুরে যায়। তাকে না অবিশ্বাস করতে পারে!

ক-দিন আগে সবেবরাত হয়ে গেছে। তাই এখন ঘোর অন্ধকার- চাঁদ, মানে ক্ষয় চাঁদটা উঠতে অনেক দেরি! হারামির বাচ্চা এই অন্ধকারকে বেছে নেবে। এই ভেবে সে তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। কিছুক্ষণ পর দূর থেকে মানসারা সত্যি দেখতে পায় মহিম আসছে—একজনের ঘরের আলো জানালা দিয়ে বাইরে পড়ছিল—তাতেই সে দেখতে পায় মহিমকে। মানসারা তাড়াতাড়ি ঘরের দরজাটা শব্দ করে ভেজিয়ে দেয়—উদ্দেশ্য—মহিম টোকা দিলে তবে খুলবে। কিন্তু এ কী! তার সমস্ত হাত-পা-গা কাঁপছে কেন! কে জিতবে? প্রতিশোধ স্পৃহা, না পরপুরুষে সঁপে না-দেওয়া, না মৃতপ্রায় লোকদের মুখে দুটো অন্ন তুলে দেওয়ার আকুতি? জীবন-যুদ্ধের এ কী সন্ধিক্ষণ! সত্যি সত্যি মহিম এসে দরজায় টোকা দেয়। ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে থাকে মানসারা দরজাটা ধরে—অস্ফুটে ফোঁপাতে থাকে।

ঘোড়েল মাল মহিম। বিকেলে যেরকম তিরকী দেখিয়ে চলে এসেছিল ভাবী, তাতে সে একটু সন্দিহান হয়েছিল। তাইতো সে চাল-ডাল আনতে সাহস পায়নি। যদি আজ কার্য সিদ্ধি হয় তাহলে কাল ভাবী যত যা চাইবে সব দেবে—তবে একদম খালি হাতে সে আসে নি —শ’খানেক টাকা আছে সাথে। একটু আশা জাগছে তার মনে, কেননা কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ আসছে ভেতর থেকে। আনন্দ হয় তার —তাই এবারে সে অস্ফুট ডাকতে থাকে “ডার্লিং, ডার্লিং”। ভেতরে শুধু অস্ফুট গোঙানি।

“এত রাতে কোথায় যাচ্ছিস মা রীনা, ও মা রীনা কোথায় যাচ্ছিস?” —ডাকে রীনার মা। মানসারাদের দু-বাড়ি পর রীনাদের বাড়ি। “এখুনি আসছি মা, আক্তার দা এসেছে, আক্তারদাকে নে একটু মানসারা ভাবীর কাছে যাব।”—উত্তর দেয় রীনা। মাধ্যমিক পাশ করে বসে আছে রীনা। এবারের ভোটে আক্তারদা-দের সঙ্গে মানসারা ভাবীদের বিরুদ্ধে খুব খেটেছিল। তাবলে ভাবীদের সঙ্গে সম্পর্ক কখনো নষ্ট হয়নি। মা বলে—“বেশি দেরি করিস নে,তাড়াতাড়ি আসবি।” “হ্যাঁ মা, তাড়াতাড়ি আসব।”—বলে রীনা আর আক্তার আসতে থাকে। প্রমাদ গোনে মহিম—“এই রে সর্বনাশ হয়েছে রে। আক্তাররা আসছে যে। এখন আসছি ডার্লিং।” বলে লাফ দিয়ে ধুপ্ করে পড়ে অন্ধকারে মিশিয়ে যায় মহিম। “আহ্ আল্লা।” বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মানসারা। যে-রাগ, ক্ষোভ, প্রতিহিংসা, বুভুক্ষুদের বাঁচানোর তাগিদে শয়তানের কাছে তার দেহ বিকিয়ে দেওয়ার এত প্রচেষ্টা—এক নিমেষেই উবে যায়।

‘ভাবী, ভাবী’ করে ডাকে রীনা। আলোটা জ্বালিয়ে দরজাটা খুলে দেয় মানসারা। দুজনের হাতে তিনটে ভরা ব্যাগ! অবাক হয়ে যায় মানসারা। সবিস্ময়ে বলে ওঠে—“এসব কী রে?” আমাদের যুবরা চাঁদা তুলে গরীব, অভাবী বা লকডাউনের জন্য খুবই অসুবিধের মধ্যে আছে যারা তাদের সাহায্যের জন্য চাল-ডাল-আলু-সোয়াবিন ইত্যাদি কিনে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে।”—ব্যাখ্যা করে রীনা। “কিন্তু, আমি তো তোদের কাউকে তো আমার অসুবিধে আছে কী নেই - তা তো বলিনি। বিশেষ করে আমি তো তোদের দলের লোকই নই।”— মানসারার প্রশ্ন। এবারে মুখ খোলে আক্তার—“বিপদের সময় দলবাজি করা উচিত নয়, আর এটা আমাদের কুষ্ঠিতেও লেখা নেই ভাবী। আর তোমার অসুবিধার কথা সরাসরি বলো নি, এটা ঠিক। কিন্তু তুমি চুপ করে ছিলে তো? আমাদের নেতা বিপত্তারণ দা শুনে বলেছিলেন—যারা চুপ করে থাকে বুঝতে হবে, তারা খুবই অসুবিধের মধ্যে আছে। আমরা লিস্ট করেছি—বাড়ি বাড়ি খাবার পৌঁছে দিচ্ছি। তুমি যে রেশনের কুপন পাওনি তা আমি বিপত্তারণদা-কে বলেছিলাম। উনি ফুড অফিসে যোগাযোগ করে ডুপ্লিকেট কুপন বের করে আমার হাতে দিয়েছেন’—বলে পকেট থেকে চারটে কুপন বের করে ভাবীর হাতে সে দেয় আর নগদ দুশ’ টাকা। ‘আর ভাবী, লকডাউন ওঠার আগে যদি কোনো অভাব হয় আমাকে বোলো, আমি পার্টির সাথে যোগাযোগ করে তা পূরণ করার চেষ্টা করব।’ এই অযাচিত সাহায্য পেয়ে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে যায় মানসারা। কোনক্রমে সে বলে—“একটু বস্ তোরা ভাই, চা করে নিয়ে আসি”—যদিও সে জানে ঘরে তার চা নেই। “না ভাবী, আজ থাক্ পরে খাব, রাত হয়ে যাচ্ছে, আসি।”—বলে বেরিয়ে যায় আক্তার আর রীনা। কী বলে যে আক্তারদের দলকে কৃতজ্ঞতা জানাবে, তাই সে ভাবতে পারছে না।

চাল-ডাল-আলু-সোয়াবিন, তেল-মশলা-নুন মায় ‘রেডলেবেল’ চা-ও আছে। আর একটা ব্যাগে আছে বিস্কুট, টোস্ট, গুঁড়ো দুধ। দেখে চোখে পানি এসে যায়। হঠাৎ মনে পড়ে রাহিলাদের কথা। তাড়াতাড়ি এক প্যাকেট বিস্কুট, ও কিছু টোস্ট নিয়ে যায় রাহিলার কাছে। রাহিলা দেখে বলে “কোথায় পেয়েছিস?” মানসারা উত্তর দেয় “আক্রামরা দিয়ে গেছে।” “ওহ্। ওরা তো আমারও দে গেছে। তুই এগুলো নে যা।” “এনেছি, আর ফিরিয়ে নে যাব? বরং বিস্কুটটা নে যাই, টোস্টগুলো থাক।” বলে বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে ফিরে যায় সে। তারপর, রোহন-মুন্নি আর শাশুড়িকে ডেকে তুলে দুধ তৈরি করে বিস্কুট-টোস্ট খাইয়ে দেয়। নিজেও খায়। আহ্ কী তৃপ্তি!

এমন সময় ফোন বেজে ওঠে এখন মনটা ভালো, তাই খুশি মনে ফোন ধরে। ও মা! এ তো মুন্নির বাপের ফোন! মনটা আরো খুশি হয়। ফোনের মোদ্দা কথা—লকডাউন ঘোষণা হতে গাড়ি ঘোড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রেজারা হেঁটে ও নানান কষ্টে হরিয়ানা থেকে দিল্লি পৌঁছয়। ওখানে পুলিশ মারধর করে কোয়ারন্টিনে রেখে দেয় দিন পনের। এখন ওরা ছাড়া পেয়েছে। ওখানকার সরকার ওদের জন্য কিছু করেনি। একটা সংস্থা ওদের খাবার দেয় প্রত্যেকদিন। লকডাউন শেষ হয়ে গেলে তবে বাড়ি ফিরতে পারবে। তাই এ কদিন মানসারা যেন একটু কষ্ট-ক্লেশ করে থাকে।

যাক্ বাবা! লোকটা যে ভালো আছে—তাতেই শান্তি। মনটা তার আরো খুশিতে ভরে ওঠে। অভাবও মিটেছে, মুন্নির বাপও ভালো আছে—আর কী চাই? এখন তার মনে হচ্ছে —এ সবই আল্লার দান। তাই আল্লার শোকার গোজারির জন্য দু-রাকাত নফল নামাজের জন্য সে অজু করতে যায়।

দিনলিপি

সায়ন

ঘড়িতে ছ'টা ঘন্টার আওয়াজ। ঝিলিক লাফিয়ে উঠলো বিছানা থেকে। সারা সপ্তাহের কলেজ লেকচার, লাইব্রেরী—পড়াশুনার যা চাপ, কিন্তু সপ্তাহ শেষে যে একটু ঘুমোবে তারও উপায় নেই — প্রাইভেট টিউশনে যেতে হবে এখন। রুমমেট শ্রীময়ীকে বলল — "উফ! বাড়ি থেকে এখানে আসার পর একটুও ঘুমাতে পারি না আর।"

একটা দীর্ঘ ঘুম লাগা নিঃশ্বাস থেকে অব্যক্ত শব্দগুলো কিছু বলে ডাকবার অপেক্ষায় পাশের বালিশ থেকে বলে — "যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল বুট পরে দুনিয়া দর্শনে...."।

না, বালিশ কথা বলে না, কথা বলছে শ্রীময়ী চোখ বোজা মন। শ্রী প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের ছাত্রী। দুনিয়া দেখবে বলে ইতিহাস পড়ছে—ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট পড়তে পারত। কিন্তু না—শ্রী বলে—ঘোরা মানে হল—একটা জায়গার আত্মার কাছে গিয়ে পৌঁছানো। সেখানেই মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় হবে। কোন মানুষ কে জানে—ঝিলিক এসব বোঝে না। নাহ! আর বসে এসব শুনতে গেলে মন আরও কথা বলবে..... ঝিলিক ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করে দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ কলেজে। মেদিনীপুরের মেয়ে, কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করার শখ ছোটো থেকেই। আসলে কলকাতার মায়াবী পরশ সবার কাছেই এক স্বপ্ন।

ঝিলিকের বাবা সমীরণ দাশ মেদিনীপুরের একজন নাম করা কবি, এবং বাবার ইচ্ছা অনুসারে সে ভবিষ্যতে কোনো সরকারি চাকরি করতে চায়।

এখন আপনি এই 'করতে চায়' নামক দুটো শব্দকে একটু আলাদা করে পাশে রাখুন। 'করতে' আর 'চায়' এরা দুজন এখন ভ্রুনাবস্থায় রয়েছে—আমরা যত এগিয়ে যাব, ততই এরা বৃহৎ আকার ধারণ করতে থাকবে। বাইরে খুব যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে—এ বছর অনেক নতুন তরুণ ভোটার মাতৃসময়গর্ভ থেকে বার হবে, হয়েই সামনে দেখবে হিটলার দাঁড়িয়ে আছে, একটা ইউনিফর্ম তার হাতে। আসতে আসতে তারা Hj হয়ে যাবে—ওহ! Hj—আবার কি? এটাই ভাবছেন তো—গুন্টার গ্রাস নামক এক মহান সাহিত্যিক শেষ শতাব্দীর মধ্য লগ্নে যুদ্ধ, সময়, শব্দ ও সাংকেতিকতার চিহ্নের কাছে মাথা নত হয়ে হিটলার—জওয়ান বা Hj বনে গেছিলেন। ঝিলিক এতক্ষণ পোষাক পরিবর্তন করছিল—সেই ফাঁকে আপনাদের সঙ্গে কথাগুলো সেরে নিলাম—ওই যে ওর গা'য়ে এখন টিয়া রঙের সালোয়ার, ঘন নীল রঙের কুচি দেওয়া চুরিদার, চুড়ির রিংরিং শব্দে—ফেংসুই সুবাতাস ভরে গেল ঘর জুড়ে। শ্রীময়ী ওর হাতটা জড়িয়ে বলল, সঙ্গে কম্বলটা আর একটু টেনে নিল—"আমি কি করতে পারি সুন্দরী! তোমার মতো আমার তো আর সরকারি চাকুরে হওয়ার সখ নেই, যাও পড়াশুনা করো, আমি ঘুমোলাম।" হাতটা ছেড়ে দেয়—ঝিলিকের মুখে হাসি, 'পাগলী একটা'—ভালোই আছিস তোরা। বাবাকে কথা দিয়েছি, না হলে এরকম একটা সুন্দর সকালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রথম আলো' আরও অনেকটা পড়ে ফেলতাম, যাইহোক...." মুখ, হাত ধুয়ে একটা অপেল খেয়ে বেরিয়ে

পড়ল রাজর্ষি মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির উদ্দেশ্যে, যাদবপুর। বিক্রমগড় বাজার তাকে পৌঁছতে হবে ঠিক আট্টার মধ্যে না হলে ক্লাস শুরু হয়ে যাবে। প্রতিটা রবিবারের সকাল ঝিলিকের কাছে একটা পরাবাস্তববাদী কবিতা। অটোতে উঠলেই একটা লোক তার পাশে এসে বসে—তার ভাষা অজানা, সে দেখে কত সকাল সকাল বাঘাযতিন, সুলেখার রাস্তাগুলো জলে ধোয়া। যেন এক অজানা বৃষ্টির গল্পের কথা লুকিয়ে আছে ওই কথায়,আর রাস্তার সদ্য স্নানের একটা বর্ণনা প্রতিটা রবিবার তৈরি হতে হতে অটোর চাকা ঘুরতে থাকে। অটো সুলেখা মোড় পার হলেই চারটে লাইন বলে—কিভাবে তার অনুবাদ যেন সচল হৃদয়ের লণ্ঠনে একটা শিখা তৈরি করে। মাঝে মাঝে অটোওয়ালা পিছন ফিরে শোনে ওই বিরল ভাষা—“কী নরম নিজেদের মধ্যে বুঁদ হয়ে / আঙুল প্রমাণ আঁচড় বিষয়ে দস্তুর মতো দুর্ভাবিত /ওরা তাদের গাড়ি / আর তার বাম্পার ধুয়ে মুছে রাখছে।” ব্যস, লাইনগুলো শেষ হতে হতে যাদবপুর এসে যায়—কিন্তু লোকটা কই! ঝিলিক প্রথম প্রথম একটা অলৌকিক অসহায়তা নিয়ে প্রতিদিন ক্লাসে প্রবেশ করত। একটা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করে যাচ্ছে অজানা চারটে লাইন। নাকি শুধু চারটে লাইন প্রবেশ করছে না, উপস্থিত আর অনুপস্থিতের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা চারটে লাইনের সঙ্গে তার বোঝাপড়া এখনও শেষ হয় নি। নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া মানুষ কি এতটা উপস্থিত থাকতে পারে?

অটো থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে ঝিলিক বিক্রমগড় যায়, ব্যাগ থেকে একটা বই বার করে, মাৎসও বাশোউএর ‘দূর প্রদেশের সংকীর্ণ পথ’.... একটা চা’য়ের দোকানের বেঞ্চে বসে পড়ে।

....“এক কাপ চা দেবেন তো”

সচরাচর সকালবেলায় মিস্ত্রি, মুটে ট্রেন ধরবার আগে এই চায়ের দোকানে এসে ঘুগনি রুটি খায়। হঠাৎ বিদ্যুৎ শিখার মতো একজন নারীর আগমন দোকানের পরিবেশ ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে যাওয়া শুকনো পাতার মতো করে দিল। ঝিলিক অবাক হয়ে বলল—আপনারা সবাই উঠে পড়লেন কেন?

—“না না দিদি, আপনি বসেন, টেরেন ধরতে এখনি ছুটতে হবে”

—আমি দুটো লাইন পড়ব বলে এখানে বসলাম—এই লাইনগুলো আর পড়া যাবে না কয়েকদিন পর জানেন। রসিয়ে কসিয়ে, বিভিন্ন ডাক শুনতে পাই, দুর্ঘটনা লোভী মুন্ডক, গ্রীষ্ম পরিখা গ্রস্থ পাখির কণ্ঠের উচ্চারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ঢুকে পরা সন্ত্রাসবাদী যারা ক্লাস রুমের জানলা দিয়ে হ্যান্ড গ্রেনেড ছুঁড়ে দিল, যার বিরুদ্ধে কোনও এক ছাত্র কিংবা ছাত্রী এম সিক্সটিন রাইফেল তাক করে আছে..... এই সব চোখে ভাসে কানে কানে কথা বলে। তার আগে দুটো লাইন আমি পড়তে চাই।

ওই পড়তে চাওয়াটুকুর মধ্যেই বলেছিলাম না ‘করতে’ আর ‘চায়’ শব্দদুটো বিরাট আকার নেবে। ওদেরকে নিয়েই বাশোউ পাঠ করে বলবে—“যাকে চলে যেতে হয়। তার বিষন্নতা এবং যে পশ্চাতে পড়ে থাকে তার শোক নিয়ে আমরা দু’জন একজোড়া বন্য হংসের মতো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মেঘের নামে হারিয়ে গেলাম।”

—তারিখ ২৮ শে জানুয়ারি, ১৯৯৮

—দাদা ডাইরিটার দাম কত?

—কুড়ি টাকা।

রূপ কুড়ি টাকা দিয়ে ওয়েলিংটন মোড় থেকে বাসে উঠবে। ভাবল একবার শ্রী’কে ফোন করি। শ্রী মানে শ্রীময়ী চক্রবর্তী, সদ্য বি.কম পাশ করা হাসিখুশি স্কুলের নতুন আন্টি। রূপের বান্ধবী, তারই প্রাক্তন স্কুলে শিক্ষিকা হয়ে নতুন জয়েন করেছে। রূপের স্বপ্ন ভ্রমণ করা, শ্রী মাঝে মাঝে বলে, ঠিক ঝিলিক যা বলেছে শ্রী’কে। ফোনটা বাজছে শ্রী’র.... ‘বলে ফ্যাল’।

—ইতিহাস নিয়ে পড়তিস জানতাম না তো!

—কি হয়েছে রে, গ্যাস না অম্বল

হাসতে হাসতে রূপ বলে আজ একটা দারুন জিনিস কালেক্ট করলাম...না বই না ... একটা ডায়েরি। কাল রোববার, ডায়েরিটা একটা রবিবারের ঘটনা দিয়ে শুরু হচ্ছে, কিন্তু শব্দগুলো না অনেক কিছু বলছে—যে বলাগুলো এখনও শেষ হয় নি, অনেক সংকেত বিপদের, যেখানে একটি মেয়ে ঝিলিক অটোর মধ্যে দেখতে পাচ্ছে পাশে বসে আছে ‘জেরা-জেরবার’-এর কবি গুন্টার গ্রাস।

হঠাৎ ঘড়িটা খারাপ হয়ে গেল শ্রীময়ীর, একি!

ঝড়ের পাখি

ম্যাক্সিম গোর্কি

অনুবাদ—মিহিররঞ্জন মণ্ডল

রূপালি সমুদ্রের অনেক অনেক উপরে বাতাস ঝোড়ো মেঘেদের জড়ো করে। আর অন্ধকারে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো ওই মেঘ ও সমুদ্রের মাঝে চক্কর দিয়ে বেড়ায় এক ঝড়ের পাখি—ছোট্ট একটা পেট্রেল।

সমুদ্রের ঢেউগুলো বুঝি ওর ডানা ছুঁয়ে একটু সোহাগ করে। ছোট্ট পেট্রেল এবার তীরের মতো সোজা আকাশে ওঠে আর মেঘ ফালাফালা করে কেটে—সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে ফেটে পড়ে। প্রচ্ছন্ন এক অনাবিল আনন্দের ছোঁওয়া রয়েছে ওতে, মেঘেরা যেন টের পায়।

পাখির ওই চিৎকারে যেন ধ্বনিত হয়—প্রবল এক ঝড়ের জন্য ওর সুতীব্র আকুলতা, ওর জ্বলে ওঠা উষ্ণ আবেগ, ওর ক্রোধ আর সুনিশ্চিত জয় সম্পর্কে ওর আত্মবিশ্বাস।

সামুদ্রিক গাল পাখিরা কিন্তু ভয় পায়। ভয়ে তারা শুধু গোঙায়। জলে ছোটাছুটি করে। সমুদ্রের মসিকৃষ্ণ গভীরতার মধ্যে তাদের আতঙ্ক যেন ঢেকে রাখতে চায়।

আর গ্রিব পাখিরা? তারা কেবলই বিলাপ করে। কারণ লড়াই করার উল্লাস তারা উপভোগ করতে পারে না। বজ্রপাতে যে তাদের ভীষণ ভয়!

ওদিকে বোকাসোকা পেঙ্গুইন পাখিরাও কেমন যেন সন্ত্রস্ত। বড়ো পাথরের ফাটলে মুখ গুঁজে ভয়ে তারা জড়সড়ো।

আর ঝড়ের পাখি পেট্রেল? রূপালি সফেন সমুদ্রের বুকে সে একাই শুধু দাপিয়ে বেড়ায়।

আরও নিচু হয়ে কালো ঝোড়ো মেঘগুলো এবার সমুদ্রের বুকে নেমে আসে। বজ্রের নাগাল পাওয়ার আশায় ফুঁসে ওঠা ঢেউগুলোর সে কী ব্যাকুলতা ক্রমশই তারা যেন স্ফীত হতে চায়।

ভীষণ জোরে বজ্রপাত হল।

এবার শুরু হয় জলের সঙ্গে বাতাসের দারুণ লড়াই। প্রচণ্ড রোষে বাতাস জলরাশিকে অজগর পাকে জড়িয়ে ধরে—সজোরে নিক্ষেপ করে খাড়াই পাড়াড়ে। চূর্ণবিচূর্ণ হয় মরকত সবুজ জলরাশি।

শুধু অন্ধকারে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো আকাশে চক্কর দিয়ে বেড়ায় ঝড়ের পাখি আর চিৎকার করে। তিরের মতো ঝোড়ো মেঘ ফুঁড়ে সোজা নিচে নেমে এসে তাড়াতাড়ি জল কেটে আবার উড়ে যায়।

অশরীরীর মতো উড়ে চলে ছোট্ট পেট্রেল। সে যেন ঝড়ের মূর্তিমান অশুভ অশরীরী। কখনও বা হাসে, কখনও বা কাঁদে। ঝোড়ো মেঘেদের দেখে হা-হা করে হেসে ওঠে। আর অন্তরের অনাবিল আনন্দে সে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

বজ্রপাতের শব্দে অশরীরী যেন ফুরিয়ে যাওয়ার ফিসফিসানি শুনতে পায়। সে জানে ঝড়ও একসময় থেমে যাবে। শেষপর্যন্ত সূর্যই জয়ী হবে। সূর্য তো চিরকালই বিজয়ী।

সমুদ্রের জল ফুঁসে উঠছে। কড়কড় করে বজ্রপাত হয়। সফেন সমুদ্রের উপরে আকাশের ঝোড়ো মেঘের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে কালচে-নীল বিদ্যুৎ আর নিচে বিপুল জলরাশি ওই বিদ্যুৎ ভল্লটিকে ধরে ফেলে নিভিয়ে দেয়। বিদ্যুতের সর্পিল প্রতিবিম্বটি দুমড়ে মুচড়ে সমুদ্রের অতলে বিলীন হয় অচিরেই।

আসছে—ঝড় আসছে।

নির্ভীক ঝড়ের পাখি একা আকাশে ওই বজ্রপাতের মধ্যেও চক্কর দিয়ে বেড়ায়। নিচে সমুদ্র একেবারে টালমাটাল, ক্রমাগত ফুঁসছে। ওর ওই চিৎকারে প্রতিধ্বনিত হয় সেই বিজয়োল্লাস—যা নাকি জয়ের অমোঘ ভবিষ্যৎবাণী।

আসুক, ঝড় আসুক। আক্রোশে ফেটে পড়ুক।

(১৯০১ সাল। রাশিয়ায় তখন চলেছে জারের শাসন। দেশের সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার অন্ত নেই। তাদের উপর একের পর এক নেমে আসছে নানান ধরনের দমন পীড়ন। ক্ষোভে ফেটে পড়তে চাইছে তারা। কিন্তু দোর্দণ্ডপ্রতাপ জারের বিরুদ্ধে কারও মুখ খোলার উপায় নেই। এই সময় এগিয়ে এলেন রুশ সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কি। তিনি বুঝেছিলেন জারতন্ত্রের পতন আসন্ন। বিপ্লবের পদধ্বনি তিনি শুনতে পাচ্ছেন। তাই দেশের মানুষের কাছে একটা বার্তা দিতে মিলহীন চতুর্মাত্রিক কবিতার আদলে লিখে ফেললেন রূপকধর্মী এই আখ্যান। এর বিষয়বস্তু হল ছোট্ট একটা পেট্রেল—এক ধরনের পাখি। সাধারণত প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝার সময় এদের আকাশে উড়তে দেখা যায়। গোর্কির এই আখ্যানে ছোট্ট পেট্রেল যেন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মানুষের চিরন্তন সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক। এটি প্রকাশিত হওয়ার পর জারের কোপে পড়ে তিনি গ্রেপ্তার হন। অল্পকাল পরে অবশ্য তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।)

‘দি সঙ অফ দি স্টর্মি পেট্রেল’
ম্যাক্সিম গোর্কি ইন্টারনেট আর্কাইভ থেকে সংগৃহীত

নিখোঁজ বিবেক

পার্থপ্রতিম পাল

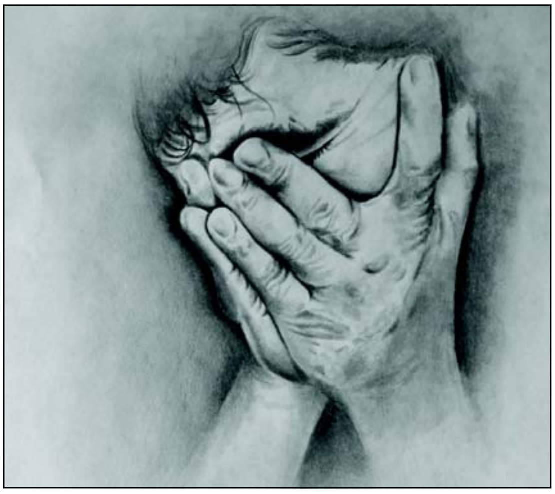

শনিবারের বিকেল। বাঁকুড়াগামী কলকাতার দিক থেকে আসা সরকারি বাস থেকে হরিণখোলা বাস স্টপে দু'টো বড়ো বড়ো ব্যাগ নিয়ে নামলেন প্রসূন হালদার। মুন্ডেশ্বরী নদীর তীরে গাছগাছালিতে ভরা ছোট্ট গ্রাম হরিণখোলা। দু-একটা চা-দোকান ছাড়া অন্যান্য দোকানপাট সব বন্ধ। রাস্তায় লোকজন খুব একটা নেই। তবে বলাই-এর চা দোকানটা রাতটুকু ছাড়া সারাদিন খোলা থাকে। দুপুরের খাওয়াটা সে দোকানেই সেরে নেয়। দিনকাল ভালো নয় বলে সন্ধ্যের পরেই দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যায় আর খুব ভোরে এসে দোকান খোলে। প্রসুনবাবুর বাড়ি তাজপুরের হালদার পাড়ায়। বাসস্টপ থেকে প্রায় মিনিট ১৫-২০-র হাঁটা পথ। কলকাতা থেকে প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা ঝাঁকুনি খেতে খেতে আসছেন। রাস্তার হাল খুব খারাপ। প্রসুনবাবুর কলকাতায় ব্যবসা। প্রতি শনিবারই তাঁকে বাড়ি আসতে হয়। রবিবারটা বাড়িতে থেকে সোমবার আবার খুব সকালের বাসে কলকাতায় ফিরে গিয়ে দোকান খোলেন। বাড়িতে অসুস্থ মা, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁর সংসার। ছেলেমেয়েগুলো ছোটো। বাড়ির পাশেই হাই স্কুল। সেখানেই পড়াশুনা করে। প্রসূনবাবু সপ্তাহে একদিন এসে সারা সপ্তাহের দোকান বাজার করে দিয়ে যান। স্ত্রী মৌসুমি অসুস্থ শাশুড়ির দেখাশোনা সহ, ঘর সামলানোর সমস্ত কাজ একা হাতে করে। স্ত্রীর ওপর প্রসূনবাবুর খুব ভরসা। কলকাতায় যত কাজই থাক প্রতি শনিবার তিনি বাড়ি আসবেনই। মৌসুমিও পথ চেয়ে বসে থাকে। তবে বাস থেকে নেমে পাড়ার ছেলে বলাই-এর হাতের এক কাপ চা না খেয়ে তিনি ফেরেন না। বলাইও প্রসূনবাবুকে খুব ভালোবাসে। বলাইয়ের বিপদে আপদে প্রসূনবাবু তাকে সাহায্য করেন।

প্রসূনবাবুকে বাস থেকে নামতে দেখেই বলাই দোকান থেকে বেরিয়ে প্রসুনবাবুর হাত থেকে ব্যাগগুলো নিয়ে দোকানের ভেতর রাখে। প্রসূনবাবুর দিকে জলের জগটা এগিয়ে দেয়। প্রসূনবাবু চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে খানিকটা জল ঢকঢক করে খেয়ে নেন। দোকানে খদ্দের সেরকম নেই। দু-একজন যাঁরা মাচায় বসে গল্প করছিলেন তারা একটু সরে গিয়ে প্রসূনবাবুকে বসার জায়গা করে দিলেন। বলাই অতি যত্ন সহকারে চা-এর কাপটা প্রসূনবাবুর হাতে তুলে দিল।

প্রসূনবাবু—(চা-এ চুমুক দিয়ে) 'বলাই, দেশের খবর কি? দোকানপাট সব বন্ধ কেন?'

বলাই—'কি আর বলব দাদা, খবর ভালো না, কোনোরকমে বেঁচে আছি।'

প্রসূন—'কেন, কেন, এ কথা বলছ কেন?'

বলাই—'বলছি কি আর সাধে। নিত্যদিন অশান্তি। ঝামেলা লেগেই আছে। দেখছেন না লোকজন নেই।'

প্রসূন—'কে আবার ঝামেলা করল।'

বলাই—'আমার এইটুকু দোকান। এর সামান্য আয়ে কোনোরকমে সংসার চলে। আমাকে বলে কিনা প্রতিমাসে হাজার টাকা করে দিতে হবে।'

প্রসূন—'কে বলেছে?'

বলাই—'কেন, পার্টির লোকেরা।'

প্রসূন—'কোন পার্টি?'

বলাই—'আরে দাদা তুমিও যেমন, এখন তো একটাই পার্টি। কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে অন্য পার্টি করে? টাকা দিতে না পারলে দোকান ভেঙে দেবে বলেছে।'

প্রসূন—'তাই নাকি? দিনে দিনে কি হল রে বলাই?'

বলাই—'আরও শুনবে? তোমাদের পাশের বাড়ির নেপাল কাকাকে দুদিন আগে হুমকি দিয়ে গেছে ১০,০০০ টাকা না দিলে তার জমির ধান বাড়িতে আনতে দেবে না।'

প্রসূন—'এ কি মগের মুলুক!'

বলাই—(এদিক ওদিক তাকিয়ে) 'আস্তে কথা বল দাদা। শুনতে পেলে রক্ষে রাখবে না। তুমি এখানে সবসময় থাকো না। ওরা যা খুশি করতে পারে।'

প্রসূন হালদার কেমন যেন গুটিয়ে যায়। আর কোনো কথা বলে না। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে খালি কাপটা বলাই-এর হাতে তুলে দেয় এবং বাড়ি ফেরার জন্যে উঠে দাঁড়ায়। বলাইকে বলে ব্যাগ দুটো বের করে দিতে।

স্যার, আমার বিবেককে দেখেছেন? অনেকদিন ধরে খুঁজছি, তাকে খুঁজে পাচ্ছি না।' .... আলুথালু বেশে এক বৃদ্ধ হঠাৎ দোকানে হাজির হয়ে প্রসূনবাবুকে শুধোয়। প্রসূনবাবু কিছু বুঝতে না পেরে বৃদ্ধ-র মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। বৃদ্ধ মাচায় বসা অন্যান্যদের দিকে আঙুল দেখিয়ে প্রসূনবাবুকে বলেন—'জানেন, রোজ আমি এদেরকে জিজ্ঞেস করি, কিন্তু কেউ এখনও পর্যন্ত ওর খোঁজ দিতে পারেনি। আপনাকে আমি নতুন দেখছি, ভাবলাম আপনি হয়তো আমার বিবেকের খোঁজ দিতে পারবেন। প্রায় তিন মাস ধরে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। বলুন না তাকে দেখেছেন কিনা।' প্রসূনবাবু কিছু বলার চেষ্টা করতেই বলাই ঈশারায় তাকে থামিয়ে দিয়ে বৃদ্ধকে বলে—'মাস্টারমশাই, দাদা এই কলকাতা থেকে ফিরেছেন, এখন ক্লান্ত। বাড়ি যাবেন। আপনি পরে কথা বলবেন।'

বৃদ্ধ—'কলকাতা থেকে আসছেন? তাহলে তো আমার কথা আপনাকে শুনতেই হবে। আমি বেশি সময় নেব না।'

বলাই এদিক ওদিক তাকিয়ে বৃদ্ধকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। প্রসূনবাবুকে দোকানের ভেতর ডেকে নেয়।

প্রসূনবাবু—'আহা বলাই থামো না। মাস্টারমশাই কি বলেন শুনিই না।'

বলাই ঈশারায় প্রসূনবাবুকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে মাস্টারমশায়ের মাথায় গন্ডগোল আছে। কিন্তু প্রসূনবাবু বৃদ্ধকে দোকানের ভিতরে বসিয়ে বলাইকে বলে চা দিতে। জিজ্ঞাসা করে—'আপনি যেন কাকে খুঁজছেন বললেন।'

বৃদ্ধ—'আমার ছেলে বিবেককে।'

প্রসূন—'আপনার ছেলের নাম বিবেক?'

বৃদ্ধ 'হ্যাঁ স্যার, আমার একটি মাত্র ছেলে। যাদবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে, চাকরি হয়নি। খুব স্পষ্টবাদী। অন্যায় দেখলেই প্রতিবাদ করে। ছোটোবেলা থেকেই ওর এই স্বভাব। আমিই ওর নাম দিয়েছিলাম বিবেক। আমিই ওকে শিখিয়েছিলাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ওর এই স্বভাবের জন্যে অনেক ঝামেলা পোয়াতে হয়েছে। অবশ্য এখন মনে হচ্ছে আমারই ভুল। এখনকার পরিস্থিতিতে আমার শিক্ষা মূল্যহীন। তাই পাশ করে যখন বাড়ি ফিরে এল আমি ওকে অনেক বোঝালাম। ওর চাকরির জন্যে অনেক চেষ্টা করলাম। চাকরির জন্যে ঘুষ দিতে গিয়ে আমার প্রভিডেন্ট ফান্ড-এর জমানো সমস্ত টাকা শেষ হয়ে গেল। ওরা ঘুষ নিল কিন্তু চাকরি দিল না। ছেলেটা মনমরা হয়ে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করত।'

বলাই বৃদ্ধের দিকে চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিয়ে--- 'মাস্টারমশাই চা খান।'

বৃদ্ধ চা-এ চুমুক দিয়েই ফের বলতে শুরু করলেন। 'জানেন, সেদিন আমি ওকে বাইরে বেরোতে বারণ করেছিলাম। কিন্তু সে আমার কথা শুনল না। ঝড়ের বেগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। সেইযে বেরিয়ে গেল, আর ফিরল না।'

প্রসূন—'কেন, কি হয়েছিল?'

বৃদ্ধ —'মাস তিনেক আগে প্রতাপনগরের মাঠে মন্ত্রী তাপস সরকার এসেছিল। দলের লোকেরা এক সপ্তাহ ধরে প্রচার চালিয়েছিল। বলা হয়েছিল মন্ত্রী মানুষের অভাব অভিযোগ শুনবেন। বিবেকের মনে অনেক ক্ষোভ জমা হয়েছিল। ভেবেছিল মন্ত্রীমশাইকে বললে হয়তো একটা ব্যবস্থা হবে। বোকা ছেলে বুঝতে পারেনি যে সব সত্যি কথা সব জায়গায় বলতে নেই।'

প্রসূন—'তারপর কি হল?'

বৃদ্ধ—'যেটুকু শুনেছি ঐদিন সভায় গন্ডগোল হয়। আমার ছেলে গন্ডগোলে জড়িয়ে পড়ে। মন্ত্রীর দলের লোকেরা ওকে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। আমি থানা থেকে ওকে ছাড়িয়ে আনতে গিয়েছিলাম। আমাকে বলা হয় ও থানায় নেই। আমি নিখোঁজ ডায়েরি করতে চেয়েছিলাম। থানা ডায়েরিও নেয়নি। তিনমাস হয়ে গেল তার কোনো খোঁজ নেই।' বলতে বলতে বৃদ্ধ মাস্টারমশাই কেঁদে ফেললেন। 'ওর মা রোগশয্যায়, সে বোধ হয় আর বাঁচবে না। (প্রসূনবাবুর হাত দুটো ধরে) আমার বিবেককে খুঁজে দিন না স্যার।'

বলাই—'মাস্টার মশাই আপনি এখন বাড়ি যান। সন্ধ্যে হয়ে এল। আপনার ছেলে ঠিক একদিন ফিরে আসবে। দাদা খোঁজ নেবে।'

প্রসূনবাবু—'হ্যাঁ, আপনি এখন বাড়ি যান। আমি খোঁজ খবর নিয়ে দেখছি।'

বৃদ্ধ মাস্টারমশাই চোখ মুছতে মুছতে দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন। প্রসূনবাবু এদিক ওদিকে তাকিয়ে বলাইকে চুপিসাড়ে বললেন—'বলাই, এবার আসল কথাটা বলোতো, ওনার ছেলের সত্যিকারের কি হয়েছিল? কেনই বা তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? এ বিষয়ে তুমি কিছু জান?'

বলাই—(একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে)—'তোমার বাড়ি যেতে দেরি হয়ে যাবে না?'

প্রসূন—'তুমি বলো না। ঘটনাটা জানতে ইচ্ছে করছে।'

বলাই আর এক কাপ চা প্রসূনবাবুর হাতে দিয়ে, দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে বলতে শুরু করল—

'আমার দিদিবাড়ি প্রতাপনগরে। ঐদিন মন্ত্রীর ডাকা মিটিং-এ আমার ভাগ্নাও গিয়েছিল। ভাগ্নার কাছ থেকে শুনেছি .... খুব ঢাক ঢোল পিটিয়ে মিটিং-এর আয়োজন করেছিল মন্ত্রীর দলের লোকেরা। বলেছিল মন্ত্রীমশাই মানুষের সমস্যার কথা শুনবেন। সব অভাব অভিযোগের সমাধান করবেন। লোকজনও ভালো হয়েছিল মিটিং-এ। বিকেল ৪টেয় মিটিং শুরু হয়েছিল। মন্ত্রীমশাই অনেক ভালো ভালো কথা বললেন। তিনি এবং তাঁর দল এলাকার উন্নয়নে কি কি কাজ করেছে তা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করলেন। আগামী দিনের পরিকল্পনার কথাও সকলকে জানালেন। সবশেষে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন — 'আপনাদের কার কি সমস্যা আছে আমাকে বলুন। আপনারা নির্দ্বিধায় বলতে পারেন। দেখবেন আজকের পরে আর কোনো সমস্যা থাকবে না।'

মাস্টারমশাইয়ের ছেলে বিবেক মিটিং-এ চুপচাপ বসেছিল। মন্ত্রীমশায়ের কথা শেষ হতেই হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল — 'স্যার , আমার কিছু কথা আছে, আপনাকে জানাতে চাই।'

মন্ত্রী—'হ্যাঁ বাবা, বলো। আমি তো তোমাদের মতো যুবক ছেলেদের সমস্যা শোনার জন্যেই এসেছি।'

বিবেক—'স্যার আপনি বললেন যে আপনার এলাকায় কোনো শিক্ষিত বেকার নেই। কিন্তু স্যার, আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বসে আছি। আমার বাবা আপনার পি এ মারফত দু'লাখ টাকা দিয়েছে। কিন্তু আজও আমার চাকরি হয়নি।' সভার মধ্যে গুঞ্জন সৃষ্টি হল। মন্ত্রীর দলের লোকেরা তেড়ে এল বিবেকের দিকে।'

মন্ত্রী—(চোখমুখ লাল করে) 'তোরা থাম। ও আর কি কি বলতে চায় বলুক।'

দলের লোকেরা আবার যে যার জায়গায় চলে গেল।

বিবেক —'স্যার, আপনি বলেছেন আপনার এলাকা উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে। সবাই সুখে শান্তিতে আছে। কিন্তু আপনি কি জানেন স্যার গত একমাসে আপনার এলাকার চারজন চাষি দেনার দায়ে আত্মহত্যা করেছে। তাহলে উন্নয়ন হল কিভাবে?'

সভায় গুঞ্জন আরও বেড়ে গেল। মন্ত্রী অস্বস্তিতে। ঘন ঘন তোয়ালে বের কের ঘাম মুছছেন।

বিবেক—'স্যার, এটা আমার শেষ প্রশ্ন। আপনি বলেছেন যে মা-বোনেদের আপনি সম্মান করেন। তারা আপনার কাছে দেবীর মতো। তাদের প্রতি কোনো অসম্মান হলে আপনি তার শেষ দেখে ছাড়বেন। কিন্তু স্যার, দু'মাস আগে আমাদের পাশের গাঁ বিরাটীর রতন ঘোষের মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করা হল । মাঠে ঘাস কাটতে গিয়ে সে আর ফেরেনি। যিনি এই কাজটা করেছেন তিনি আপনার পাশে বসে আছেন। পুলিশের খাতায় তার নাম থাকা সত্ত্বেও পুলিশ তাকে ধরছে না সে আপনার লোক বলে। সভায় কোলাহল বেড়ে গেল। জনতা উঠে দাঁড়িয়ে মন্ত্রীর দিকে আঙুল উঁচিয়ে চিৎকার করতে লাগল। মন্ত্রী এবার হুঙ্কার দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

মন্ত্রী—(রাগতঃ স্বরে) 'বন্ধুগণ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজ আমাদের এই শান্তিপূর্ণ সভা পন্ড করার জন্য বিরোধীদল ঐ ছেলেটিকে (বিবেকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে) এখানে পাঠিয়েছে। আমি উন্নয়নের পূজারী। আর এ হচ্ছে উন্নয়ন বিরোধী। উন্নয়নের যে বিরোধিতা করে সে দেশদ্রোহী। আমি মনে করি এই দেশদ্রোহীর উপযুক্ত সাজা হওয়া উচিত।' মন্ত্রীর কথা শেষ হওয়ার আগেই মন্ত্রীর দলবল বিবেকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাধারণ জনতা যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। সেইদিন থেকে বিবেককে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি।

প্রসূন—'বিবেক গেল কোথায়?'

বলাই—'সে তো কেউ জানে না। কেউ কেউ সন্দেহ করছে ওকে নাকি মেরে মুন্ডেশ্বরীর চরে পুঁতে দিয়েছে। খুব ভয়ংকর লোক ঐ তাপস সরকার। ও পারে না এমন কাজ নেই।'

প্রসূন—'প্রতিবাদ করতে গিয়ে ছেলেটা অকালে চলে গেল।'

বলাই—'দাদা, সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বাড়িতে বৌদি চিন্তা ভাবনা করবে। এবার বাড়ি যান। আমিও বাড়ি যাব। তবে আপনাকে একটা অনুরোধ দাদা। আজ যা শুনলেন কোথাও যেন আমার নাম করবেন না। বুঝতেই তো পারছেন।'

প্রসূনবাবুর মাথাটা ঝিমঝিম করছে। বাড়ি যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। ব্যাগদু'টো নিতে গিয়ে মাথাটা একটু ঘুরে গেল। উনি আবার বসে পড়লেন।

বলাই—'দাদা, শরীর খারাপ লাগছে? আপনি কি একা যেতে পারবেন? আমি কি আপনার সঙ্গে যাব?'

প্রসূন—'না—না, তার দরকার নেই। আমি একাই যেতে পারব।'

বলাই—'আরে, আমি তো ঐ পথেই যাব। আমি আপনাকে একা ছাড়ব না। মিনিট পাঁচেক ওয়েট করুন। আমি জিনিসপত্র গুছিয়ে দোকানটা বন্ধ করি, একসঙ্গে যাব।'

প্রসূন—'তুমি এখন যাবে! ঠিক আছে।'

বলাই প্রসূনবাবুর ব্যাগ দু'টো সাইকেলের হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে নিল। দুজনে গল্প করতে করতে বাড়ির পথে রওনা হল। কিন্তু বলাইয়ের কোনো কথাই যেন প্রসূনবাবুর কানে ঢুকছে না। তার সামনে শুধু ভেসে উঠছে বৃদ্ধ মাস্টারমশায়ের অশ্রুসিক্ত করুণ মুখখানা আর জর্জরিত হচ্ছেন বিবেকের দংশনে।

মাছ

অখিল চক্রবর্তী

ভর বর্ষার রাত, আট সাড়ে আটটা হবে, টালির চালের কাদার গাথনির কাঁচা মেঝের রান্না ঘরে একটা বছর দশেকের মেয়ে, বছর আষ্টেকের এক ছেলে আর বছর তিনেরেক এক মেয়ে মায়ের পাশে জলন্ত কাঠের চুলোর দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে আছে। কিছু দুরে দেলখোয় এক টিনের লম্ফ কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে জ্বলে যাচ্ছে। কড়াইতে যদিও কুমড়ো ডাটার এক কড়াই জাবরা সেদ্ধ হচ্ছে কিন্তু কেরোসিন পোড়া, কাঠপাতা পোড়া আর তরকারির গন্ধ মিশে একটা অবর্ণনীয় গন্ধ ঘরে ছড়িয়ে আছে। ঘরে চাল নেই, বাড়ির কর্তা, এক স্কুল মাস্টার, ঘরে ফেরার পথে নিয়ে আসার কথা। সেটাও কথা না, ওই তিনটি শিশু কড়াইটা নামালেই খুশি, তাতে যা আছে তাতেই খুশি কারণ ওতেই তাদের অসহ্য পেটের জ্বালা মিটবে ভাত টাত পরে হবে।

হঠাৎই তড়বড়িয়ে বৃষ্টি নামল সাথেই বাড়ির কর্তাও কাপড়চোপড় সামলে বাড়ি ঢুকল আধভেজা হয়ে—বাচ্চা তিনটে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল, বাবা এসে যাওয়ায় যত না খুশিতে চাল এসে গেছে এই খুশিতে।

মা উঠে গিয়ে ছাতা ধরতে গিয়ে, কর্তা মশাই এই সের দেড়েকের এক ইলিশ তার দিকে এগিয়ে দিতেই, চাল আনো নি প্রশ্ন! বাবা একটু হেসে, দোষ কাটানোর ভঙ্গিতে বলল, বাজারে তো ঢুকলাম চালটাল নিতেই, সুরেশ এমন জবরদস্তি শুরু করল, মাস্টারমশাই বাজার ফাঁকা, দামও কম, এরকম মাছ পাবেন না, একটা নিয়েই যান, আমিও ভাবলাম কতদিন ইলিশ খাওয়া হয় না তাই নিয়েই নিলাম।

বাচ্চা তিনটে খিদে ভুলে অবাক হয়ে অতবড়ো ইলিশ দেখছে, মাও একটু মুচকি হেঁসে মাছ নিয়ে কাটাকুটিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল যথারীতি তিনজন ঘিরে বসল। রান্নাও হল, অনৈসর্গিক গন্ধে চারিদিক ম ম করতে লাগল।

একফাঁকে মা পাশের কর্মকার বাড়ি গিয়ে তিন কৌটো চাল ধার নিয়ে এল।

খুব খুশি, খুব আনন্দ, খাওয়া দাওয়াও হল। সবাই গণবিছানায় শুয়েও পড়ল, বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়লে মা কাজ কর্ম সেরে শুতে এল।

স্বামী স্ত্রীতে টুকটাক কথাবার্তা হতে বাবা বলল, আরে আমি তো জানি একটা ব্যবস্থা তুমি করবেই, “চাল তো ধার পাওয়া যায়, মাছ তো যায় না”।

(এটা ১৯৬০/৬১ সালের এক মাস্টারমশাই-এর বাস্তব ঘটনা।)

কবিতার ডালি

স্বদেশ

দীপক হালদার

চলো যাই
আমর্ম দাঁড়াই সমস্ত দুঃখের পাশে
দুঃখী মানুষকে বলি তোমার সুখটাই আমার সুখ
আমার গানে তোমার স্বর
পল্লবিত হ'লে
সম্পন্ন হয় সমাজ

বাতাসে এখনো ভাসে ফুলেল সুবাস
ঘাসে ঘাসে হীরক কণার
প্রোজ্জ্বল অক্ষর ধ্বনিময় জীবনের কথা বলে
আজও মায়ের আঁচল ছায়া
সেরা আবাসন
এখনও স্বজন বলতে তুমি
এই ভূমি তোমার আমার আমাদের

চলো যাই
আমর্ম দাঁড়াই সকলে সকলের পাশে
বলি এইতো স্বদেশ
চির সবুজ শ্যামল

ত্রিশঙ্কু

সৈয়দ জিয়াউল হক

জমি হাসিল করতে করতে মোকাম বানাতে বানাতে
জঙ্গাল লুপ্তপ্রায়, হতশ্রী।
বাস্তুতন্ত্রে জমে উঠছে আবর্জনা, জঞ্জাল—
আস্তাকুড়ে জন্ম নিচ্ছে বিশ্বগ্রাসী রোগ-ভাইরাস।
ভোগের প্রসাদ জোগাতে জোগাতে প্রয়োজন মেটাতে মেটাতে
জাঁক জমকের জীবনে উঠছে সমস্যার ষাঁড়াষাঁড়ি বান;
ডুবে যাচ্ছে বিদ্যাবুদ্ধিসহ বাঁচার সরঞ্জাম—
প্রাণ হাতে করে প্রাণের তাগিদ হাবুডুবু, হায় হায়!
সভ্যতায় অজস্র আলো জ্বেলে বহু পথ অতিক্রান্ত
ফিরে ফিরে চেয়ে দেখি পিছনের সব পথে নিভন্ত আলো
এগিয়ে যাওয়ার ঠিক-ঠিকানা অস্পষ্ট, অনিশ্চিত;
নিঃশেষে ধরিত্রীকে শুষে-পিষে হাজার কোটির বেপরোয়া মস্তি
থম মেরে আছে।
চাষিরা ভয়ে ও ভরসায় ধরনা দিয়ে এখনও অনড়—
দায়িত্বজ্ঞানহীন রাষ্ট্রশক্তি বিকট, বিরূপ।
উৎফুল্ল মুখগুলি বিমর্ষ-সন্ত্রস্ত প্রকৃতির মারে—
কলহাস্য-মহোৎসব এখন শুনশান শ্মশানের ভেংচি।
নিকেতনে বিদ্যার্থীর আনাগোনা নেই
কাজ হারানো শূন্যদৃষ্টি মানুষ ক্ষুধায় কাতর।
পণ্যভারে তেমন চলে না তরী
ওড়ে না আগের মতো বিমান
ট্রেনে নেই যাত্রী-ভিড়, মুখোশপরা মন-মরা ইস্টিশান।
চাকা ঘুরছে না, চিমনির ধোঁয়ায় ঢাকে না আকাশ, তবু
এত দিনের অজস্র ছোবল খাওয়া বিষ তো আর নামে না!
এই বিষ আরও ভারি বিদ্বেষের বিষে।
বিষে বিষে জ্বালাতন—ভুগছে জনতা।
বিষহরি কে কোথায় বিষাক্ত আবহে?
অরণ্য-সভ্যতার ডাক যেন মর্মে মর্মে শুনি—
বলে, ফিরে এসো প্রকৃতির সন্তান!
কিন্তু ফিরে যাওয়া কী সম্ভব? না গেলে বাঁচা কী সম্ভব?

ডাউন আটটা বাইশ লোকাল

সুব্রত ভুঁইয়া

একটু পরে তুমি স্টেশনে ঢুকবে—
জানি, তোমার জঠরে বুক সমান অমার্জিত ঘাস,
আর থিক্ থিক্ করছে জনসংখ্যা, প্রতিটি কামরায়।

‘মেরা ভারত মহান’, তাই সঠিক সময়ে ভেণ্ডার
কামরা থেকে, বয়সের ভারে জুবু থুবু, লাঠি হাতে,
মাথা ভর্তি শনের নুড়ি নিয়ে, ময়লা কাপড়ে আমার
মা, প্লাটফর্মে নামবে এখনি। ঠিক এই মুহূর্তে যে কোনো
স্টেশন—সে পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা, দিল্লি অথবা
দক্ষিণ কিংবা উত্তর ভারত যেখানে আমার মা পা
রাখবে সেটাই ভারতবর্ষ।

হ্যাঁ ভারতমাতা রোজ সকালে লোকাল ট্রেন থেকে
নেমে আসে, তার ঝোলায়—কয়েক আঁটি নিমপাতা,
কলমি শাক, মুঠোখানেক থানকুনি, গোটা চারেক ডিম,
কচুরলতি আর কুমড়ো ফুল নিয়ে বসবে লোকাল বাজারে—

আসলে ওই পয়সায় দুবেলা অন্ন হবে গণতন্ত্রের!

বড়ো আদর করে একমাত্র ছেলেটার নাম রেখেছে গণতন্ত্র,
জন্ম থেকে প্লাস্টার-করা হাত পা নিয়ে কিভাবে যে বেঁচে আছে?

এইতো সামান্য পসরা ও মূলধন! এতে কি করে চলে?
এর থেকে আর কি স্বচ্ছতা চাও? আমার স্বামীটা
সেই কবে, অনেক আগে পতাকা হাতে গুলি খেল, এখনতো
পতাকার অপমান কেউ গায়ে মাখে না—তবে
পড়াশোনা জানত লোকটা। দেশ আর মানুষকে বড়ো
ভালোবাসত।

কি জানি, সবাই বলে, ঝাড়ুদার বলে মানুষটা ছোটো ছিল না,
নিজের কাজটা খুব মন লাগিয়ে করত। ফাঁকি দিত না। আর

আর ভালো সাবান আনত আমার জন্য, গন্ধ তেলও—হায়!
মানুষটার কথা বড্ড মনে পড়ে, তখন চারপাশে ভাবি,
কেউ নেই, ভীষণ একা, ডাউন আটটা বাইশ, তুমি
ছিলে বলে সঙ্গা পাই। ভেণ্ডারে সবাই আমায় জায়গা দেয়।
শাকপাতা বেচে পেট চলে। খোঁড়া ছেলেটা যাইহোক,
বেঁচেবর্তে আছে। শুধু ভয় হয় মিটিং শুনতে
গিয়ে গাছে ঝুলে আত্মহত্যা না করে?

এমনি করে ভারতমাতা স্টেশন থেকে স্টেশনে ইতিহাস
লেখে রোজ ডাউন আটটা বাইশ লোকালে।

দুটি কবিতা

অনুশ্রী তরফদার

সমধর্ষক

ফুলের বাগানে দৈত্যের হানা
তছনছ বাগান, পাপড়ি ছেঁড়া দুমড়ে মুচড়ে ফুলগুলো ভুলুণ্ঠিত
দৈত্যরূপী ধর্ষক রাজসেবা পায় গারদে।

কলমের কালি—শুকিয়েছে আজ রক্তের কোষাগারে।
বুদ্ধিজীবীদের মেমোরি ফেরার, মুক্ত রসাতলে
মোমবাতি হাতে একসাথে পথে নীরব ধিক্কার,
যদিও পরিচিত ছবি হারিয়েছে অস্তাচলে।

স্বাধীনতার স্বাদ ফুলেদের কাছে শাস্তি—
শোষণের যাতনা পেষণের যন্ত্রণা চলে অবিরাম
তবুও মূর্তির মতো মূঢ় থাকে শাসক
দেহ ধর্ষকের হ্যাঁ তে হ্যাঁ মেলায় মন ধর্ষকের দল।

অন্তর্জালের সিন্দুকে—
উঁকিঝুঁকি মারে দৃশ্য ধর্ষকের দল
কিন্তু আমরা স্থবির আমরা জগদ্দল পাথর।
কলি হতে পূর্ণ ফুল কিংবা পাপড়ি আলগা হয়ে যাওয়া ফুল
বাদ যায়না, প্রত্যেকেই রসনার পদ।

কখনো ভূমি ছোঁয়া মাত্রই লিঙ্গা ধর্ষকের শিকার
আলোতে ফুটে উঠতেই বিকৃত দৈত্যের ভোগ্য
দৈত্যেরা নাবালক, সাবালক বৃদ্ধ শকুন।

বিচারের প্রতিক্ষায় দুর্ভাগা মায়ের আর্তি,
সে তো পৌঁছায়না চোখ ঢাকা দাঁড়িপাল্লার কাছে,
শাসকের চোখে ঠুলি শোষকের মনে ভয়হীন উন্মাদনা,
আর আমরা? দুদিনের চিৎকারে বিচার চাই অনর্গল।

আবার শান্ত হই থেমে যায় জনরব
কোথাও নতুন বাগানে পুনরায় দৈত্যিক তাণ্ডব।

স্বপ্নসবুজ

সবুজ সেই মাঠে দৌড়াতে ভালো লাগে
খোলা হাওয়ায় নিজেকে স্বাধীন মনে হয়
কিন্তু যে মাঠে চোরকাটা—
ঘাপটি মেরে অপেক্ষায় থাকে
সেখানে দৌড়াতে, ঝাঁপিয়ে বেড়াতে নারাজ
তার চেয়ে লম্বা দূর্বা কিংবা,
ছোট দণ্ডকলসের ফুলে ভরা মাঠ
বড়ো প্রিয় বড়ো আপন,
মধুও নেয়া যায়,
তাদের পরশ মাখা স্বচ্ছ আদর—মন ভালো করে।

কোণের দিকের বকুল গাছটাও বড়ো মিষ্টি,
তলায় বিছিয়ে দেয়,
সুবাসিত পুষ্প চাদরের আন্তরিকতা,
এক মুঠো করতলে নিলে—
অহঙ্কার জন্ম নেয়,
দখিন দিকের কৃষ্ণচূড়ার গোড়ায় বাঁশের মাচা—
সোহাগ করে কাছে এনে, বিশ্রামের সুযোগ দেয়,
আরো আছে প্রতিবেশী বৃক্ষ, গুল্ম—
কিংবা ব্রততী, যৌথ সোহাগি পরিবার।

এক মায়া ভরা আত্মীয়তা, হাজার স্বপ্নের সাজি,
কৃত্রিম আবেগ হতে তফাৎ রেখে,
বহু যোজন যোজন দূরে,
মুক্ত আকাশের তলে নির্ভেজাল বসুন্ধরা,
প্রতিক্ষণে হাতছানি দিয়ে চলেছে,
মাতাল করার অভিলাষে,
সবুজ সেই মাঠেই দৌড়াতে চাই,
যেখানে চোরকাঁটা নেই,
স্নিগ্ধ শীতল ভালোবাসা শুধু।

শুদ্ধি

অলক্তিকা চক্রবর্তী

স্নান সেরে ওঠা সকালবেলায়
একটা আলোর পৃথিবী খেলা করে

জগৎ সংসারে পবিত্র পূজার ফুল তোলা সহজ নম্রতায়
পরিমল বাতাসে ভেজা ভেজা রং
চোখের পাতা, ভ্রু-পল্লব, শিকড়ের কোষে কোষে
স্পর্শ করা জলকণারা কেমন নির্ভর
পরম মমতায় কমনীয়
প্রশ্রয় দেয় অপরিণামদর্শী জলকণাদের আন্দোলন

দিন বা রাতের ব্যাখ্যাও কেমন উঠে আসে আবহে
আর আলগা আলগা হয়ে ঝরে পড়তে থাকে বর্ণমালার স্তোত্র

এক মনে ঘটিবাটি কুলুঙ্গি নেড়েচেড়ে আচমন করার ফাঁকে
যথারীতি আড়চোখে জরিপ করে
অদূরেই পড়ে থাকা গৃহস্থাশ্রম।

উত্তরণ

বাসুদেব ভট্টাচার্য্য

এসময় বড়োই দুঃসময় কালো মেঘে ছেয়ে আছে সর্বত্র
কালের গর্ভে ডুববে তরী না কি হবে কাল উত্তীর্ণ!
ধর্ম অধর্মের নোংরা জালে শূন্য সামাজিক ভারসাম্য
বিভেদের সীমারেখাতে জাগছে চিরকালীন বৈষম্য।

তোমার কষ্টের রক্ত ঘামে উৎপাদিত ফসলের ভাণ্ডার
অজান্তেই আশ্রয় নিয়েছে কীটপতঙ্গ, তোমার নেই অধিকার
তোমার আমার শ্রমের শিল্প বিক্রি, চক্রান্তের মিথ্যে বাজারে
কর্ম লুপ্ত কোটি বেকারত্ব, ভুখা পেট মৃত্যু মিছিলের দুয়ারে।

সাবধান হে কাণ্ডারী! সময় আছে নতুন দিগন্তে যাত্রার
বিষাক্ত কীট ঝেড়ে ফেলে বিকল্প পথে তরী বাইবার
যে করেই হোক পেরোতে হবে দুর্গম সময় সংকল্প দুর্নিবার
অসহায় নিরন্ন মানুষের জন্য শাণিত করো নৈতিক হাতিয়ার।

উদ্দেশ্য হোক দৃঢ়, মহীরুহ সম, হৃদয়ের জোর হোক ঢাল
যাত্রার পথে বাধা দেয় যদি, আবর্জনাময় বিষ প্রবাল
কাণ্ডারী! আর বিষণ্ণতা, অনুতাপ নয়, শক্ত হাতে ধরো হাল
সব পেয়েছির দেশে—নিতে হবে তরী, অপেক্ষায় নতুন সকাল।

প্রকৃতির প্রতিশোধ এবং পরিবেশ চেতনার অভিমুখ

তাপস চট্টোপাধ্যায়

সার্কাস দেখতে কার না ভালো লাগে। বিশেষ করে ট্রাপিজের খেলা কিংবা সরু তারের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, কখনো হাতে লাঠি অথবা কাঁধে আর একজনকে নিয়ে। তবে আমরা ক'জন ভাবি, কত দিনের কঠোর অধ্যবসায়, পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা-এইসব বৈশিষ্ট্যকে একটি বিন্দুতে সংবদ্ধ করে শরীরের ভরকেন্দ্র ও ব্যালেন্স বা ভারসাম্য অর্জনের কৌশল এমন খেলার গোড়ার কথা। সার্কাসের কুশীলবরা শিখে নিয়েছেন ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য অর্জনের দক্ষতাকে নিজেদের পেশাদারি জীবনের সাথে একাত্ম করে নিতে।

মানুষের সমাজেও একই সত্যের রকমফের। রাষ্ট্রের সংবিধান থেকে-প্রশাসন ও জনসমাজে বহুবৈচিত্র্য ও স্তরের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির একমাত্র শক্তি হল স্বতন্ত্রের স্বাতন্ত্রকে মর্যাদা দিয়ে বহুধা বিভক্ত উপাদানের মধ্যে ভারসাম্য অর্জন করতে পারা। অমনি সমাজ হয়ে ওঠে রামধনুর মত মনোরম, প্রতিটি প্রত্যঙ্গ নিজস্ব স্বাতন্ত্র বজায় রেখেও একটি ঐক্যের সুতোয় গাঁথা মালা হয়ে ওঠে। মানুষের ব্যাক্তিগত জীবনেও একই সত্যের নানান রূপ, বহুর মধ্যে ভারসাম্য রাখতেই হয়, তবেই সুস্থ জীবন ও যাপন।

এই পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে আমরা যা বুঝি, সেখানেও প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার উচ্চারণ। মাটি, জল, বায়ুমণ্ডল, প্রজাতি ও জীববৈচিত্র- প্রতিটি উপাদান নিজেদের মধ্যে গড়ে নিয়েছে এক আশ্চর্য সমঝোতা, ভারসাম্য যার অনিবার্য শর্ত, সামঞ্জস্য যার ভাষা ও বিভঙ্গ। সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরে চলেছে কোটি কোটি বছর ধরে। আবার নিজের কক্ষেও পাক দিচ্ছে ২৪ ঘন্টায় একবার। একবার ভাবা যাক যে পৃথিবী তার অক্ষ বা কক্ষপথ থেকে একচুল এদিক বা ওদিক নড়ে গেল। এবার কী হবে? পৃথিবী নামের সৌরজগতের এই গ্রহটা হয় সূর্যের উপরে হুমড়ি দিয়ে আছড়ে পড়বে কিংবা মহাকাশের অনন্ত জগতে কোথাও ছিটকে চলে যাবে। পৃথিবীর সব প্রাণ ও বস্তু, সবই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে চোখের পলকের থেকেও চটজলদি। মোট কথা, পৃথিবী ও তার প্রকৃতি নিজস্ব ব্যালান্স বা ভারসাম্য ছাড়া টিকে থাকতে পারবে না।

কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখছি? ২০১৮ সালে প্রকাশিত 'পরিবেশ সাফল্য সূচক' (এনভায়রনমেন্ট পারফরমেন্স ইনডেক্স) অনুসারে ভারতের স্থান মোট ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৭৭ নম্বরে। পরিবেশের মৌলিক বৈশিষ্ট্য, যেমন জনস্বাস্থ্য, বনাঞ্চল, আবহাওয়া, বায়ুর মান, পানীয় জলের সরবরাহ ও বিশুদ্ধতার মান, কৃষি, জীববৈচিত্র্য, বাসস্থান, দূষিত গ্রীণ হাউস গ্যাসের মাত্রা, জ্বালানির (ফসিল ফুয়েল) ব্যবহার ইত্যাদি মোট ২৪টি সূচকের মানদণ্ডে ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় আছে। এই ধরনের পরিবেশের বিপর্যয়কর পরিমণ্ডলে দেশের মানুষ, উদ্ভিদ, প্রাণীজগত এবং জীববৈচিত্রের বিপন্নতা নিয়ে বেশি কথা অর্থহীন। আমরা নিজের যাপনকে যতটা পরিচ্ছন্ন,স্বাস্থ্যসম্মত ও দূষণমুক্ত রাখতে সতর্ক থাকি, সমাজযাপনকে ততটাই তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও কলুষিত করতে পিছপা হই না। উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ন করার সময় আইন বাঁচাতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোঁডের ছাড়পত্র আদায় করায় আদাজল

খেয়ে লেগে থাকি, কিন্তু আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে পরিবেশবিধি অবলীলায় অস্বীকার করি। এভাবে চলতে চলতে আমরা আবার একটি অবরপক্ষকে তৈরি করলাম, যারা কোনো প্রকার উন্নয়ন দেখলেই পরিবেশ দূষণের বার্তা নিয়ে ঐ প্রকল্প বন্ধ করতে তেড়ে আসেন। এমনকি জনজীবনের জন্য অপরিহার্য পরিকাঠামো তৈরির প্রকল্প রূপায়নের পথেও পরিবেশবাদীদের বিরোধীতা নতুন কোনো কথা নয়। এই দুই পরস্পরবিরোধী যুযুধান পক্ষের মাঝখানে প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্নির্হিত নিয়মাবলী অর্থাৎ তার ভারসাম্য বজায় রাখার অন্তর্লীন শর্তগুলো দিব্যি ধূলায় লুটিয়ে পড়ছে। সুস্থিত উন্নয়ন অর্থাৎ উন্নয়ন এবং পরিবেশ পরস্পরের সহায়ক ও সহযোগী হয়ে সামাজিক পরিকাঠামো নির্মাণ করবে, এই ধারণাটি এঁরা মানতেই রাজি নন। তথাকথিত আধুনিকতার সাথে মতাদর্শের এমন বৈরিতা আধুনিক মননের কলঙ্ক ছাড়া আর কী?

আসলে সৌরজগতের একমাত্র এই গ্রহেই প্রাণ থাকার কারণ, সবকিছুই একটা আশ্চর্য ব্যবস্থাপনার সাম্য অবস্থানে আছে। বিজ্ঞানীরা এসব কথা জানেন। তাই রাশিয়ার পরমাণু বিজ্ঞানীরা ১০০ মেগাটন টি. এন. টি. ক্ষমতাসম্পন্ন হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষা থেকে(১৯৬১ সালের ৩০শে অক্টোবর) পিছিয়ে আসেন। পরীক্ষামুলক সেই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল ৫০ মেগাটন টি. এন. টি. ক্ষমতার বোমা দিয়ে। এমন বিপুল বিস্ফোরণে যদি পৃথিবী তার কক্ষ থেকে একচুলও নড়ে যায়, সেই আশঙ্কায় এই সিন্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। প্রমাণ হল যে প্রকৃতির ব্যালান্স বা ভারসাম্য যাতে বিপদগ্রস্ত না হয় সেকথা সর্বদাই স্মরণে রাখতেই হবে।

এই পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশকে সক্ষমভাবে নিরন্তর সচল রাখার জন্য প্রকৃতি নিজেই তার সকল উপাদানের মধ্যে একটি ভারসাম্যের সূত্র তৈরি করে রেখেছে। মাটি-জল-বায়ু এবং জীব বৈচিত্র্য (বায়োডাইভার্সিটি) এক আশ্চর্য ভারসাম্য ও পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্যের সমীকরণে বাঁধা। একটু টলে গেলেই সর্বনাশ, বিপর্যয় ও ধ্বংস অনিবার্য। তাই তো প্রকৃতিতেই সাজানো আছে প্রাণের সুরক্ষা ও সংরক্ষণের বিপুল বলয়। এমন নয় যে পৃথিবী নিজেই এমন ভারসাম্য সর্বদাই রক্ষা করতে বা নির্ভুলভাবে চলতে পেরেছে। আগ্নেয়গিরি, দাবানল, ভুমিকম্প, সুনামী, টর্নেডো, সাইক্লোন ইত্যাদি ভারসাম্য ব্যবস্থাকে নাড়িয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের শরীরের ইমিউনিটি যেমন বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই করে আবার সুস্থ স্বাভাবিকতায় ফিরে আসে, প্রকৃতিও তেমনি একটু টলে গেলেও আবার সাম্য অবস্থা নিজেই ফিরিয়ে নেয়। প্রকৃতির নিজের মধ্যেই বিষপান করার একটি মাত্রাধীন ক্ষমতাও আছে। গাছপালা বায়ুর দুষিত কার্বন মনোক্সাইড,ডাই অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাসকে শোষণ করতে জানে, সাগরের জলেও অনেক দূষণ-দ্রবীভুত হয়ে থাকে, মাটিরও সহজাত শক্তি আছে, দূষণ প্রতিরোধ করার জন্য তার ক্ষমতাও কম নয়। প্রাণী ও উদ্ভিদকুলকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, গণিতের হিসাবের মতোই নিখুঁতভাবে চলছে প্রকৃতির অন্তর্লীন চেষ্টা। আবর্তিত হচ্ছে বিভিন্ন চক্র, যেমন কার্বন চক্র, নাইট্রোজেন চক্র এবং জলচক্র ইত্যাদি। শীতপ্রধান দেশে নদ-নদী হ্রদ জমে বরফ হলেও নীচের অংশ জলই থাকে, সেখানে জলজ প্রাণী দিব্যি বেঁচে থাকে কারণ প্রকৃতি নিজেই নিজের নিয়ম ঠিক করল যে ৪ডিগ্রি তাপমাত্রার নীচে জলের আয়তন আর কমা তো দুরের কথা, বরং বেড়ে যাবে। এমন হাজার উদাহরণ দেখিয়ে দেয়, আমরা বেঁচে বর্তে আছি প্রকৃতির দয়ায়।

বিনিময়ে আমাদের অবদান কী? প্রকৃতির ভারসাম্য বুঝে সেই মতো জীবনযাপন করতে আমরা শিখেছি কী? শিল্প বিপ্লবের (১৭৬০-১৮৪০) পর থেকেই অতিরিক্ত দ্রুততার সাথে ‘সভ্যতা’ কে বিস্তৃত করার জন্য মানুষের বেপরোয়া কাজকর্ম বাস্তুতন্ত্রকে (ইকোসিস্টেম) টালমাটাল করে তুলেছে। শিল্পায়ন, বৃক্ষনিধন, জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, উষ্ণায়ন, বেহিসাবী ফসিল ফুয়েলের (কয়লা, পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস) ব্যবহার, পরমাণু শক্তি নিয়ে আস্ফালন, নগরায়ন, প্লাস্টিক, বর্জ্য রাসায়নিক সার,—এর যে কোন একটিই পৃথিবীকে ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট। ভোগবাদী জীবনদর্শন গলা তুলে বলছে, কোনো প্রাণই চিরস্থায়ী নয়, ধ্বংস ও সৃষ্টি অথবা মৃত্যু ও জীবনের যাওয়া আসা তো বিজ্ঞানেরই নিয়ম। কথাটা বিজ্ঞানীরা অস্বীকার করেন না। কিন্তু গোলমালটা হয়, যখন যাওয়া ও আসা কিংবা মৃত্যু ও বিনাশ এবং জীবন বা জন্মের মধ্যে সামঞ্জস্য এবং ভারসাম্য থাকে না। এখন হচ্ছে ঠিক তাই। প্রতিবছর এই গ্রহের লক্ষাধিক প্রাণযুক্ত বস্তুর হদিস নেই। গত ৫০ বছরে ৩৯ লক্ষ স্থলচর, ৭৬ লক্ষ জলচর, ও ৩৯ লক্ষ মহাসাগরীয় প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মানুষ যেদিন থেকে প্রাকৃতিক শৃঙ্খলাকে, জীবনযাপনের মান উন্নতির জন্য এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার ও বিনষ্ট করার মাধ্যমে প্রভাবিত করেছে, সেদিন থেকে জীববৈচিত্র্য প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে ধ্বংস হতে শুরু করেছে। একটি প্রজাতির উদ্ভবের পরে প্রাকৃতিক নিয়মে তার আয়ু সর্বাধিক ৫০ লক্ষ বছর। বিজ্ঞান জানাচ্ছে, বর্তমানে প্রজাতি বা জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির হার ১০০-১০০০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০০ সালে জানা গেল বিগত ৫০০ বছরে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়েছে ৭৮৪টি জীব প্রজাতি, যার

মধ্যে আছে ৩৩৮টি মেরুদন্ডী, ৩৫০টি অমেরুদন্ডী ও ৮৭টি উদ্ভিদ প্রজাতি। ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্রের উপর এর প্রভাব হয়েছে ভয়ঙ্কর। প্রাগৈতিহাসিক যুগে গড়ে দশ হাজার বছরে ২০০টি প্রজাতি অবলুপ্ত হত। ইদানিং সময় লাগছে মাত্র ১০০ বছর। এর কারণ আধুনিক মানুষের অবিবেচক ভোগবাদী জীবনযাপন। যেমন— (১) অন্যান্য প্রাণীদের বাসভূমি ধ্বংস বা বিভাজন (২) অনুপ্রবিষ্ট আগ্রাসী প্রজাতি (৩) অপরিকল্পিত শিল্পায়ন (৪) অত্যধিক প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ (৫) জলবায়ুর পরিবর্তন (৬) দূষণ এবং (৭) জনসংখ্যার বিস্ফোরণ (তথ্যঃ রিপোর্ট ২০১৬)। ১৯৯২ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পতঙ্গ বিজ্ঞানী ও জীববিবর্তন বিশেষজ্ঞ ড. এডওয়ার্ড এবং ড. উইলসন প্রকাশ করেন যুগান্তকারী গবেষণালব্ধ বই 'দি ডাইভারসিটি অফ লাইফ'। এঁরা জানালেন, আগামী দিনে জীববৈচিত্র্যের সংকটই হবে জীবনের অস্তিত্ব এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সবচেয়ে বড় সংকট। সুস্থিত উন্নয়নের কথাও (সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট) তখন থেকেই পরিবেশ আলোচনা ও আন্দোলনের ভরকেন্দ্রে আছড়ে পড়ল।

১৯৭২ সালেই টনক নড়েছিল। ধরা পড়েছিল পৃথিবীর গভীর অসুখ অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্রের টালমাটাল অবস্থা। মানুষের আগ্রাসী ভোগবাদ কীভাবে বিপন্ন করেছে প্রকৃতির নিজের ভারসাম্য। রাষ্ট্রসংঘের নেতৃত্বে স্টকহোমে অনুষ্ঠিত হল প্রথম বিশ্বপরিবেশ সম্মেলন। তারপর থেকে প্রতিবছর পরিবেশের সুরক্ষা এবং সুস্থিত উন্নয়নের জন্য বহু বহু সম্মেলন, গবেষণা ও আন্দোলন হয়ে চলেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি নিয়ে এসেছে সুস্থিত উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি যার সুষম ব্যবহারে উন্নয়নমুলক প্রকল্প রুপায়িত হলেও পরিবেশের উপর কোনো বিরূপ প্রভাব পড়বে না। অথবা সহ্যসীমার ভিতরেই থাকে। ১৯৯২ সালের ঐতিহাসিক রিও 'বসুন্ধরা সম্মেলন' প্রকৃতির সাথে প্রাণীজগত সহ নানা প্রজাতির জীববৈচিত্র্য সেতুটা স্পষ্ট করে সকলের সামনে তুলে ধরল। সেই থেকে আন্তর্জাতিক পরিবেশ আন্দোলন অনেক মাইলফলক সৃষ্টি করেছে। ২০১৫ সালে প্যারিস শহরে অনুষ্ঠিত আবহাওয়া পরিবর্তন এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন সম্মেলনে বিশ্বের প্রায় সবকটি দেশ স্বাক্ষর করেছিল এবং সুস্থিত উন্নয়নের জন্য উন্নত আধুনিক প্রযুক্তি প্রথম বিশ্বের দেশসমূহ থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে সরবরাহের জন্য প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তার চুক্তি নতুন দিগন্ত এনে দিলে কি হবে, আমেরিকার পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধান সেই উদ্যোগকে ধ্বংস করতে হিংস্রতার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চরম দক্ষিণপন্থী এবং উগ্র জাতিবিদ্বেষী এই রাষ্ট্রনায়ক সম্ভবতঃ এই পৃথিবীর একমাত্র ব্যাক্তি যিনি মনেই করেন না যে প্রাকৃতিক পরিবেশের আদৌ কোনো সংকট আছে। উষ্ণায়ন, গ্রীণ হাউস গ্যাসের মোটা চাদরের নীচে চাপা পড়া ভুপৃষ্ঠ, জীব বৈচিত্র্যের মৃত্যু মিছিল ইত্যাদি শুনে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে গাল পাড়েন বিজ্ঞানী ও গবেষকদের।

'ইপিএ' সূচকের নিরিখে ভারতের কঙ্কালসার চেহারা দিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু হয়েছিল। এত বিপর্যয়ের পরেও আমাদের তেমন কোনো শিক্ষা হল কি? শিল্প ও কৃষির উন্নয়ন, নগরায়ন এবং জীবনকে আরো সমৃদ্ধ করার জন্য আমাদের যা কিছু উদ্যোগ, তার সাথে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্যকে একসূত্রে বিবেচনা করতে আমাদের প্রশাসন ও রাষ্ট্র আজও অপারগ। মে মাসের ২২-২৩ তারিখে তামিলনাড়ুর তুতিকোরিন শহরে, তামার আকরিক থেকে তামা ও অন্য শিল্পপণ্য তৈরির কারখানা বন্ধ হয়ে গেল স্থানীয় মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ ও আন্দোলনে। পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিতে হল কিছু মানুষকে। অথচ কারখানার মালিক যদি কারখানা থেকে নির্গত দূষিত বর্জ্য পদার্থকে যথাযথ প্রযুক্তির ব্যবহারে নিষিক্ত করার পর মাটি ও জলে মিশে যেতে দিতেন, তাহলে কারখানাটি চালু থাকত, প্রায় চল্লিশ হাজার শ্রমিক কর্মচ্যুত হতেন না। কিন্তু আমাদের শিল্পপতিরা একবগ্গা। তাদের চাই চটজলদি মুনাফা ও আরো মুনাফা। লাটাগুড়িতে উন্নয়নের জন্য রেললাইনের উপর মোটা লম্বা উড়ালপুল নির্মাণ করতে হবে বলে নির্বিচারে তিনশত গাছ কাটতেই হত? পরিকল্পনাটা কিছুটা পরিবর্তন করে পরিবেশের সাথে দূরত্বপনা এড়িয়ে যাওয়া যেত না? এমনতরো অজস্র প্রশ্ন সুস্থিত উন্নয়নের পথে দৈত্য হয়ে পথ জুড়ে আছে। প্রকৃতির পুরো ব্যবস্থাটাই প্রাণের জাদুপ্রদীপের মতো জ্বলছে। এটা মনে না রাখলে এই সুন্দর পৃথিবী অচিরেই হয়ে পড়বে আরো একটি মৃত নক্ষত্র।

বার্টান্ড রাসেল তাঁর 'দি লিমিটস অফ হিউম্যান পাওয়ার' প্রবন্ধে অধিকারের সীমারেখার কথা বলেছেন। মানুষের সর্বগ্রাসী লোভ-লালসা সমস্ত সীমারেখা ছাপিয়ে প্রকৃতির উপর নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে। এই মুহূর্তে প্রাকৃতিক পরিবেশকে তার নিজস্ব ভারসাম্যের সংস্থাপনে ফিরিয়ে না আনতে পারলে প্রকৃতির রোষানল থেকে মানুষের সভ্যতার ধ্বংস ও লয় অনিবার্য।

[লেখক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রাবন্ধিক]

সংস্কৃতির পাতা

সংস্কৃতি এখন

প্রদীপ ভট্টাচার্য্য

dreamstime.com

সংস্কৃত শব্দটি থেকে সংস্কৃতি শব্দটির উদ্ভব। ‘সংস্কৃতি’ অর্থাৎ পরিমার্জন পরিশ্রুতি। অর্থাৎ আমাদের মনন চিন্তনকে যা পরিশীলিত, পরিমার্জিত করে তাই সংস্কৃতি। আবার এটাও ঠিক যে, আমাদের একটা সাধারণ ধারণা আছে যে সংস্কৃতি মানে গান-বাজনা। প্রকৃতপক্ষে জলবায়ু বৈচিত্রের সাথে সাযুজ্য রেখে দেশে দেশে পোষাক বৈচিত্র, খাদ্যাভ্যাস, আচার-ব্যবহার, সামাজিক সম্পর্ক সবকিছুই সংস্কৃতি। স্বভাবত: সংস্কৃতি মানে মানব জীবনের এক বিরাট পরিসর। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়ন, চিকিৎসা বিজ্ঞান সহ সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষ ক্রমশ: অ-ফলদায়ী পুরানো ভাবনা-চিন্তার বিরুদ্ধে পদচারণা শুরু করেছে। এই প্রক্রিয়া প্রস্তর যুগ থেকেই চলছে। নিত্যনতুন সত্য উপলব্ধি এবং তাকে আত্মস্থ করার মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে তার আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, সমাজ জীবন—এক কথায় সংস্কৃতি বলতে যা বুঝি তা সবই। এটাই স্বাভাবিক।

সমবন্টন ব্যবস্থা(আদিম সাম্যবাদ) থেকে কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধীরে ধীরে উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদিত সামগ্রীর উপর দখল নিতে শুরু করল এবং তারাই ধীরে ধীরে শোষণকে প্রতিবাদহীন করে তুলতে গোষ্ঠীর মানুষকে তাদের শোষণ অনুসারি করে তুলতে সচেষ্ট হয়। শুরু হয় শোষকের সংস্কৃতি। জন্ম হল শোষক আর শোষিতের দুই ধারার সংস্কৃতি। শোষকের শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে শোষণকে অব্যাহত ও আরো শক্তিশালী ও প্রতিবাদহীন করে তুলতে জীবনবিমুখ ভোগবাদী সংস্কৃতি ও ধর্মীয় সংস্কৃতির মিশ্রণে এক বীভৎস সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় সচেষ্ট বর্তমান সময়ের শোষক ও শাসক গোষ্ঠী।

দিন কাটে মানুষের উদরপূর্তির রসদ সংগ্রহে। পেটের ক্ষুধা মেটানোর প্রচেষ্টার সাথে সাথে মনের একটি ক্ষুধাও খুবই তীব্র হয়ে ওঠে। আর সে ক্ষুধা মেটাবার জন্য প্রয়োজন হয় খেলা-ধূলা, গান-বাজনা, কাব্য-সাহিত্য এক কথায় রাষ্ট্রের উপরিকাঠামোর এই উপাদানগুলি। সংস্কৃতির এই উপাদানগুলি শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শোষকশ্রেণি শোষণের অন্যতম অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে আসছে। ধর্ম ও ধর্মীয় অনুসঙ্গগুলি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মন-মনোজগত ও চিন্তা-চিন্তাশক্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করা ছাড়া বাধাহীন শোষণ অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। রাজাকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে রাজার শোষণ স্বাভাবিক এবং অনিবার্য এ কথা বলা সম্ভব নয়। শোষিতকে ‘জীব দিয়েছেন যিনি আহার দিবেন তিনি’, ‘তোমার দুঃখের কারণ রাজা বা মালিক নয়-এ তোমার পূর্ব জন্মের কর্মফল’, ‘কর্ম করিয়া যাও ফলের জন্য ভাবিও না। ফল ঈশ্বরের প্রতিনিধি রাজা অথবা মালিকের প্রাপ্য’—এই ধরনের বাক্যের মধ্যে শোষিতদের আকণ্ঠ নিমজ্জিত রাখার প্রয়াস প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। সময়ের সাথে সাথে প্রচারের কৌশল পরিবর্তিত হচ্ছে। মানুষের প্রতিবাদী মন আজ ধনিক গোষ্ঠীর হাতে ভীষণভাবে আক্রান্ত। বিশ্বব্যপী সাংস্কৃতিক ভাবনাকে এককেন্দ্রিক করে তোলার অদম্য প্রয়াসে নিমজ্জিত বৃহৎ ধনিকগোষ্ঠী। বিপুল অর্থের প্রলোভনে শিল্পকে নিজের দ্রব্যের বিপণনে ব্যবহার করে চলেছে। বিপুল অর্থের প্রলোভন বিশ্বব্যাপী রুচিহীন সংস্কৃতির শিকড় প্রসারিত করে চলেছে। নারী শরীর, অশ্লীল যৌনাচারই এখন সংস্কৃতির প্রধান উপাদান। সুকৌশলে ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে সুস্থ সামাজিক সম্পর্কগুলো। ব্যাভিচারকেই স্বাভাবিক বলে জনজীবনে তুলে ধরার অদম্য প্রয়াস চলছে। হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের সুস্থ মূল্যবোধ, হারিয়ে যাচ্ছি ভোগবাদের এক অতলান্ত অন্ধকারে। নারী শরীরকে করে তোলা হচ্ছে স্বাভাবিক পণ্য। তাই দাড়ি কাটার ব্লেডের বিজ্ঞাপনেও নারীর প্রয়োজন।

সম্প্রতিকালে ভারতীয় সংস্কৃতির সুস্থ মূল্যবোধগুলি ক্রমাগত ভাঙ্গাছে। নারী ধর্ষণ এক গভীর সংঙ্কটের সৃষ্টি করেছে। সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক নেতৃত্ব উচ্চবর্ণের কোনো পুরুষের নিম্নবর্ণের নারী ধর্ষণকে অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে করেননা। বিবাহ নামক বন্ধনটি ক্রমাগত প্রহসনে পরিণত হচ্ছে। এবং এই ধরনের ব্যাভিচারকে খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয় বলে এর সামাজিক স্বীকৃতি প্রদানে সচেষ্ট সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণি। এ সবই সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের নমূনা। সংবাদপত্র, বৈদ্যুতিন মাধ্যম, সামাজিক মাধ্যমেও এ বিষয়গুলিকে সমাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিষয়গুলি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে। এই সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের কারণেই দিল্লির উপকণ্ঠে দীর্ঘদীন ধরে যুক্তিযুক্ত কারণে যে কৃষকেরা আন্দোলন করছেন সকলের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে তাদের প্রতি দেশের প্রতিটি সুস্থ চেতনাসম্পন্ন নাগরিকের যে সহমর্মিতা দেখানো প্রয়োজন তা আমরা পারছিনা যা শোষক এবং শোষক নিয়ন্ত্রিত সরকারের একান্ত কাম্য। নৃত্য, সঙ্গীত, গল্প-সাহিত্য সর্বক্ষেত্রেই উপঢৌকনের বিনিময়ে জীবন বিমুখ শিল্পের রগরগে পরিবেশন চলছে। ভুলে যাচ্ছি শোষকের বঞ্চনার কথা, হারিয়ে ফেলেছি প্রতিবাদের স্পৃহা এবং ভাষা। অনন্ত বিবরের অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা। শোষকের ইচ্ছায়, শোষকের দেওয়া উচ্ছিষ্ট উপঢৌকনে আমরা এমন এক সমাজ গঠনের দিকে এগিয়ে চলেছি যেখানে থাকবেনা কোনো সামাজিক বন্ধন, থাকবেনা মান-সম্মান, স্নেহ-ভালোবাসার কোনো অস্তিত্ব। থাকবে শুধু কদর্য ভোগের উদ্দাম ফোয়ারা। এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, সর্বগ্রাসী-সংস্কৃতি আমাদের বর্তমান প্রজন্মকে মেরুদন্ডহীন করে তুলছে।

আবহমানকাল থেকে ধর্মের প্রতি মানুষের অন্ধ আনুগত্য এবং যৌনতা দুটো মিলিয়ে এক অবর্ণনীয় কুৎসিৎ সংস্কৃতির খোলসে মানুষকে ঢুকিয়ে ফেলার জান্তব প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। মানুষকে অ-মেরুদন্ডী প্র্যাণীতে পরিণত করার এই চক্রান্তকে প্রতিহত করতে শিকড়ের অনুসন্ধানে আরো বেশি যত্নবান হতে হবে। সুস্থ সংস্কৃতি পুষ্ট মনন ছাড়া অন্যায় এবং অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই কখনই সম্ভব নয়। সলতে পাকানোর সময় শেষ হয়েছে। এখন শিখা প্রজ্জ্বলনের সময়। প্রজ্জ্বলিত শিখায় পুড়ে খাক হয়ে যাক সমস্ত কু-সংস্কার, অ-সুন্দর, অ-সুন্দরের স্রষ্টারা।

ভ্রমণ

টুমলিং-এর নীলাদি

ডঃ কৌশিক মুখোপাধ্যায়

মানভঞ্জন থেকে ৩১ কিমি দূরে হিমালয়ের কোলে বাংলার উত্তররপ্রান্তের প্রায় শেষ বিন্দু সান্দাকফু যাবার পথের মাঝেই অপার সৌন্দর্য্যের ডালি নিয়ে অবস্থান ছোট্ট জনপদ 'টুমলিং'-এর। ট্রেকার্স ব্রোসিওরে সান্দাকফু ট্রেক রুটের উল্লেখ্য স্থানের মধ্যে টোংলুর নাম থাকলেও বহুদিনই টুমলিং-এর কোনো স্বতন্ত্র পরিচিতি ছিল না। বরং অনেকের কাছেই টোংলু আর টুমলিং একই পাহাড়ি গ্রাম রূপেই চিহ্নিত হত। আজ সান্দাকফু ট্রেকিং মানচিত্রের মাঝে রাত্রিবাসের বিশেষ স্পট রূপেই শুধু নয়, আপন সৌন্দর্য্যের গরিমায় পর্যটক মহলের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে সীমান্ত পাড়ে পূর্ব নেপালের ইলাম জেলার অখ্যাত পাহাড়ি গ্রাম টুমলিং। টুমলিং শব্দটার মধ্যে এমনিতেই একটা ছন্দের ব্যঞ্জনা আছে, আর সে সুর, তাল, ছন্দের প্রকৃত উপলব্ধি পেতে হলে পা রাখতেই হয় টুমলিং-এ।

পর্যটন মানচিত্রে ঝকঝকে মুকুটে শোভিত কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ বাহারে টুমলিং-এর আজকের সগৌরব উপস্থিতি হতে তার পরিচিতির মূল কান্ডারি কিন্তু এ গাঁয়েরই এক অতি সাধারণ নেপালি রমণী, নীলা গুরুং। ষাটোর্ধ্ব নীলাদেবীর হাত ধরেই গত ২৮ বছরে তিলে তিলে গড়ে উঠেছে টুমলিংকে কেন্দ্র করে পর্যটনের বিকল্প পথের সন্ধান। আর এ কাজে শুধু নিজেই ব্রতী হননি, পাশাপাশি এ অজ পাহাড়ি গাঁয়ে তারই অনুপ্রেরণায় প্রায় প্রতিটি পরিবারেই আজ গড়ে উঠেছে আধুনিক হোম-স্টের ব্যবস্থা। তাই ছোট্ট টুমলিং-এর বাসিন্দা ৩৫-৪০ জন হলেও বছরে ছ-মাসের মূল পর্যটনকালীন সময়ে (সেপ্টেম্বর/অক্টোবর হতে ডিসেম্বর আর মার্চ/এপ্রিল হতে মে/জুন) গড়ে অতিথি থাকেন দিনে প্রায় তিন শতাধিক। নীলাদেবীর আতিথেয়তায় শিখর লজে থাকতে থাকতেই জানলাম আজকের টুমলিং গড়ে ওঠার নেপথ্য কাহিনি। ১৯৯১ সালে অর্থাৎ ২৯ বছর আগে সান্দাকফু ট্রেক করে যাবার পথে টুমলিং-এর কাছেই পা মচকে এক ইতালীয় মহিলা গুরুতর আহত হন। তখন গাড়িবাসেই ছিল ট্রেকার্সদের রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা, যা টুমলিং থেকে প্রায় ৭ কিমি দূরে, কিন্তু তার পক্ষে ঐ অবস্থায় গাড়িবাসে পৌঁছানো ছিল অসম্ভব। নীলাদেবীর শুশ্রষা আর ক্লান্তিহীন আতিথ্যে দুদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলেন সেই ইতালীয় পর্যটক। আর সে মহিলা ও তার স্বামীর পরামর্শেই সুন্দরী টুমলিংকেও সান্দাকফু ট্রেকার্সদের রাত্রিযাপনের ঠিকানা রূপে গড়ে তোলার ভাবনাচিন্তা শুরু নীলাদির। টুমলিং-মেঘমায় স্কুল জীবনের পরে দার্জিলিং-এ কলেজের পাঠ শেষ করে স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতার চাকরিকেই নিজের ভবিতব্য ধরে নিয়েছিলেন নীলাদেবী। কিন্তু এই ইতালীয় দম্পতিই তার চোখ খুলে দিল। ১৯৯৩ সালে মায়ের বাড়িতে দুটো ঘর দিয়েই পর্যটন পরিষেবায় যাত্রা শুরু হল নীলাদির। তখনও টুমলিং-য়ে নেই বিদ্যুতের কোনো বন্দোবস্ত, জলের ব্যবস্থাও অপ্রতুল। লন্ঠনের আলো, যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব সহ হাজারো বাধা পেরিয়ে দুটো থেকে পাঁচটা, সাতটা....বাড়তে লাগল ঘর। কঠিন জীবন যুদ্ধে এক নতুন লড়াইতে জয়ী হবার সুতীব্র বাসনায় নিজের উদ্যম আর উদ্যোগেই গড়ে তুলতে লাগলেন পর্যটকদের সুবিধার্থে একের পর এক ব্যবস্থা। ছড়িয়ে পড়তে লাগলো নীলাদেবীর টুমলিং-এর

কথা। শুধু ট্রেকার্সরাই নয় ধীরে ধীরে চাহিদা তৈরি হল পরিবার নিয়ে টুমলিং-এ রাত্রিযাপনের। চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে তৈরি করলেন অ্যাটাচ বাথ সহ ঘর। মায়ের বাড়ির পরিসর ছেড়ে নিজেই গড়ে তুলতে চাইলেন তার আপন সৃষ্টি আর কর্মকান্ডকে। আজ ২০ টা সুসজ্জিত ঘর আর ১৪ শয্যার ডরমেটারি নিয়ে নীলাদেবীর শিখর লজই টুমলিং-এর বুকে পর্যটকদের অন্যতম সেরা আবাসস্থল। টুমলিং-এর অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্যের সাথেই নীলাদেবী আর তার পরিবারের হৃদয় উজাড় করা আতিথেয়তাই আপনাকে যেন আবারো টেনে আনতে চাইবে সীমান্তপাড়ের এ নেপালী গাঁয়ে। 'অতিথি দেব ভব'-প্রাচীন এ সংস্কৃত প্রবাদেরই সার্থক পরিচয় যেন প্রতি মুহুর্তে অনুভূত হয় নীলাদেবী আর তার পরিবারের সহজ, সরল হৃদয় উজাড় করা ব্যবহারে।

নীলাদি

নেপাল সরকারের সহযোগিতায় বিদ্যুতের ব্যবস্থা পর্যটন বিকাশে অবশ্যই বাড়তি সহায়, তবে অবাক হয়ে গেলাম প্রত্যন্ত এ পাহাড়ি গ্রামে অপ্রচলিত শক্তির উৎস রূপে সোলার বিদ্যুতের ব্যবহার দেখে। নীলাদির শিখর লজে এমনই সোলার প্ল্যান্টে চলছে জলগরমের বন্দোবস্ত হতে ছোটো ছোটো সোলার ল্যাম্পের ব্যবহার। একদিকে যখন শিল্প-সভ্যতার বিকাশের নামে প্রতি মুহুর্তে পরিবেশের ধ্বংসলীলায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছি আমরা, আবার তারই পাশে নীলাদেবীর মতো এমন বিরল মানুষেরাও রয়েছেন যারা তাদের সীমিত পরিসরের মধ্যেও পরিবেশ রক্ষা করে, তাকে সবার জন্য আরো সুন্দর করে গড়ে তোলার অঙ্গীকারে এগিয়ে চলার পথ দেখান।

শিখর লজের সামনের পাহাড়ি ঢালে এক ব্রিটিশ বন্ধুর সহযোগিতায় কয়েক একর জায়গা জুড়ে নীলাদির উদ্যোগেই গড়ে উঠেছে রোডোডেনড্রনের বাগান। রুক্ষ্ম-সুক্ষ্ম পাহাড়ের বুকে যখন নিজের হাতে গড়া এ বাগান গোলাপি, লাল ফুলে সেজে ওঠে, বিচিত্র পাখির কলকাকলিতে ভরে ওঠে আপাত নীরব উপত্যাকার প্রান্তর, নীলাদেবীর কথায় তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি যেন তিনি তখনই সার্থক রূপে অনুভব করতে পারেন। গর্বের সাথে জানান, দেশ-বিদেশ হতে হরেক পাখির খোঁজে যারা সিংগালিলা ন্যাশানাল পার্কে যাবার কথা ভেবে টুমলিং-এ আস্তানা গাড়েন, তারা তখন নীলাদেবীর এ বাগানেই রঙিন রোডোডেনড্রনের আড়ালে পেয়ে যান তাদের বহুকাঙ্খিত বিরল পক্ষীকূলের হদিস।

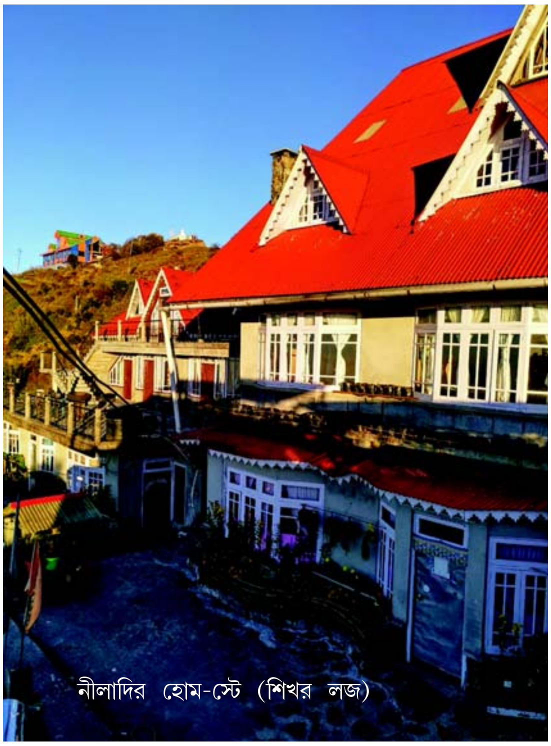
নীলাদির হোম-স্টে (শিখর লজ)

করোনা মহামারীর থাবায় হাঁপিয়ে ওঠা বন্দীদশা হতে মুক্তির দুর্নিবার আনন্দে নিজেকে মেলে ধরতে সান্দাকফু যাবার পরিকল্পনা যেন আরো সার্থক হল টুমলিং-এ দুরাত্রি যাপনে। শিখর লজ থেকে সামনে তাকালেই নিচে শিখাদির হাতে গড়া রোডোডেনড্রনের বাগান আর দিগন্ত বিস্তৃত উপত্যকায় রাতের আঁধারে তারার মতো জ্বলে থাকা নেপালি জনপদগুলোয় যেন এক অদ্ভুত কোমল শান্তি মিশে রয়েছে। আর লজ থেকে কয়েক পা উপরে উঠলে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে দুচোখ ভরে দেখতে হবে প্রসারিত কাঞ্চনজঙ্ঘার অসীম, অনাবিল সৌন্দর্য্যকে। এ-ও এক সীমান্ত, যেখানে যুদ্ধ-বোমা-গুলি-ছররা বাদ দিন, ভিসা-পাসপোর্টের কাগুজে বাধাও নেই। আর সীমান্তপাড়ের এ শান্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যেন পড়ন্ত বিকেলের অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভায় কাঞ্চনজঙ্ঘার শায়িত বুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ অবয়ব পরিষ্কার প্রত্যক্ষ করলাম। সঙ্গে বাড়তি পাওনা একই ফ্রেমে বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্টকেও পেয়ে যাওয়া। নিভন্ত আলোয় কাঞ্চনজঙ্ঘা হতে এভারেস্ট ছুঁয়ে রাতের আঁধার যখন নিচের জঙ্গলে ঘনিয়ে আসছে, ঠিক সে মুহূর্তেই ক্যামেরায় ধরা পড়ল লম্বা লেজওয়ালা ইয়েলো-বাইন্ড-ব্লু-ম্যাগপি। পূব আকাশের দিকে উড়তে উড়তে মিলিয়ে যাচ্ছে ম্যাগপি, সোনালি থালার মতো পূর্ণিমার 'ব্লু-মুনের' ঝলকানির আভাতে ঝকঝকে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়োর বরফ....সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত জমছে, ঠান্ডা বাতাসে শিখাদির হাতের গরম পকোড়া আর পেয়ালা ভরা গরম চায়ের টানে পাড়ি দিলাম লজের দিকে।

তুষারধবল কাঞ্চনজঙ্ঘা, শায়িত বুদ্ধ ও এভারেস্ট